গুরুদেব ও শান্তিদেব

শান্তিদেব
ও
শান্তিনিকেতন

সিংহলে শান্তিদেব
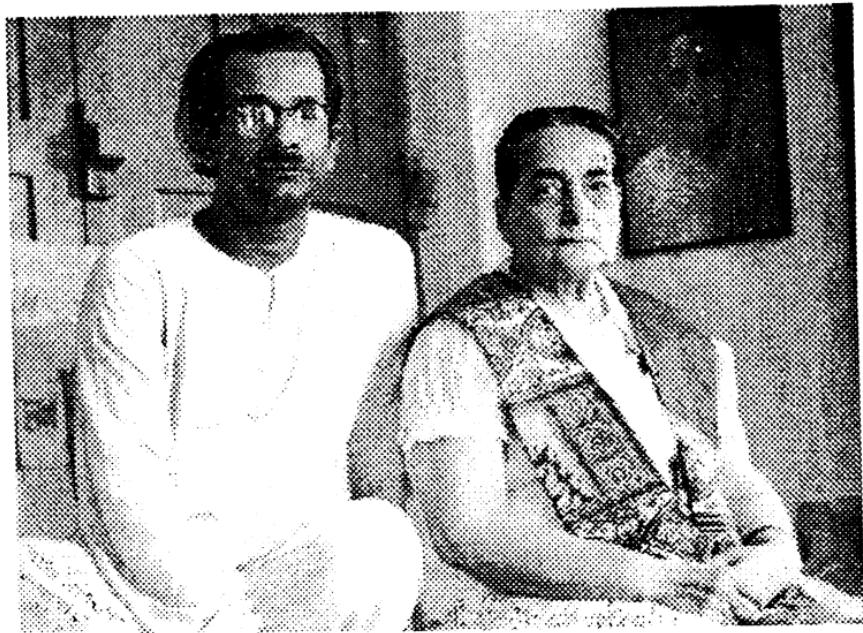
শান্তিদেব ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী
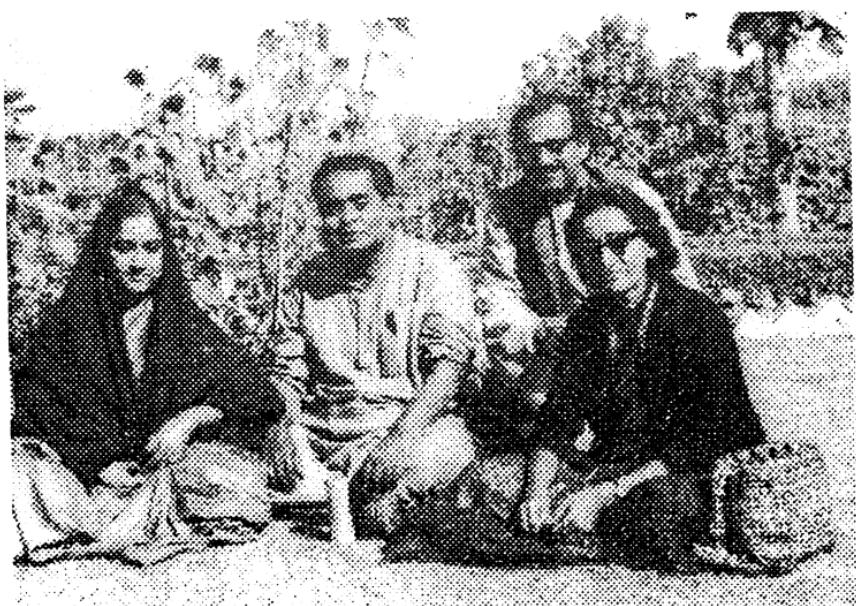
কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবব্রত বিশ্বাস, সুচিত্রা মিত্র ও শান্তিদেব
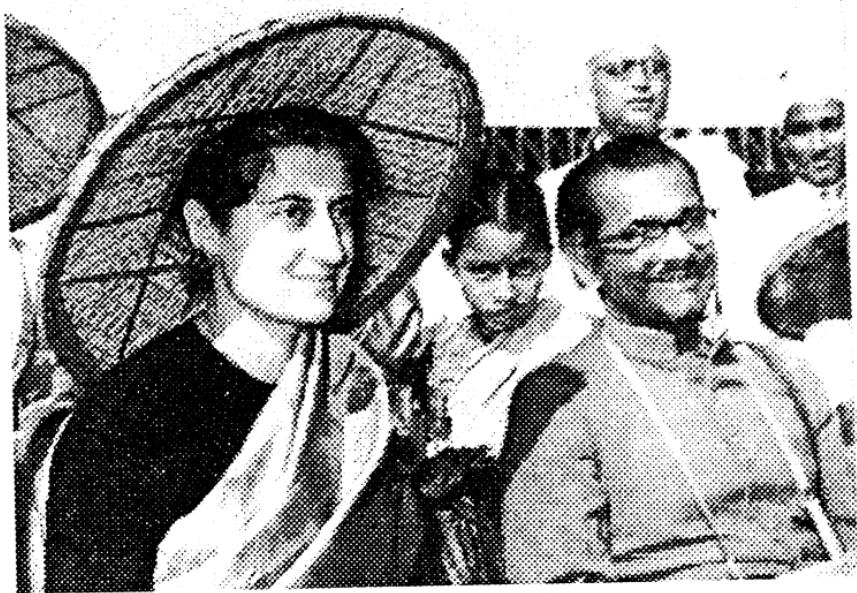
শান্তিদেব ও ইন্দিরা গান্ধী

শান্তিদেব ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

শান্তিদেব ও কালীপদ পাঠক

শান্তিদেব ও শান্তিনিকেতন

শান্তিদেব ও মাদার টেরেসা
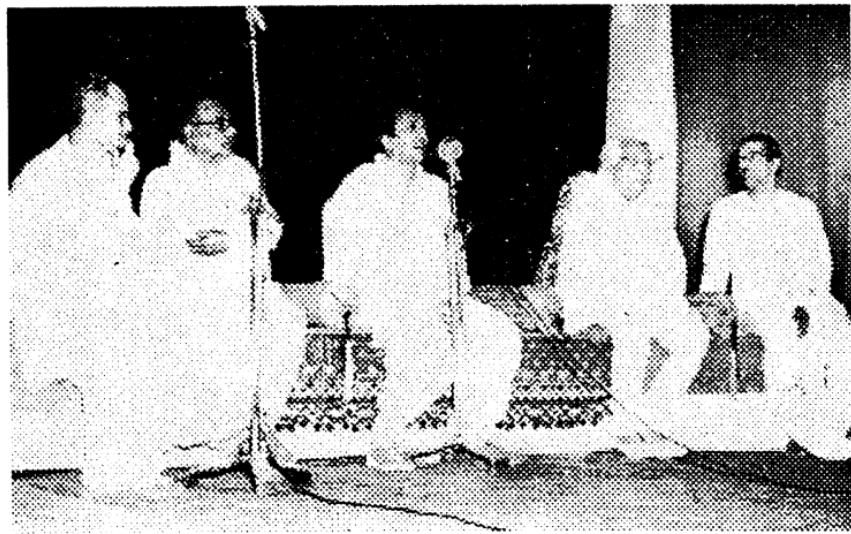
রবীন্দ্রলাল রায়, শৈলজারঞ্জন মজুমদার, রবিশঙ্কর, সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও শান্তিদেব

দেবব্রত বিশ্বাস, সুচিত্রা মিত্র, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শান্তিদেব
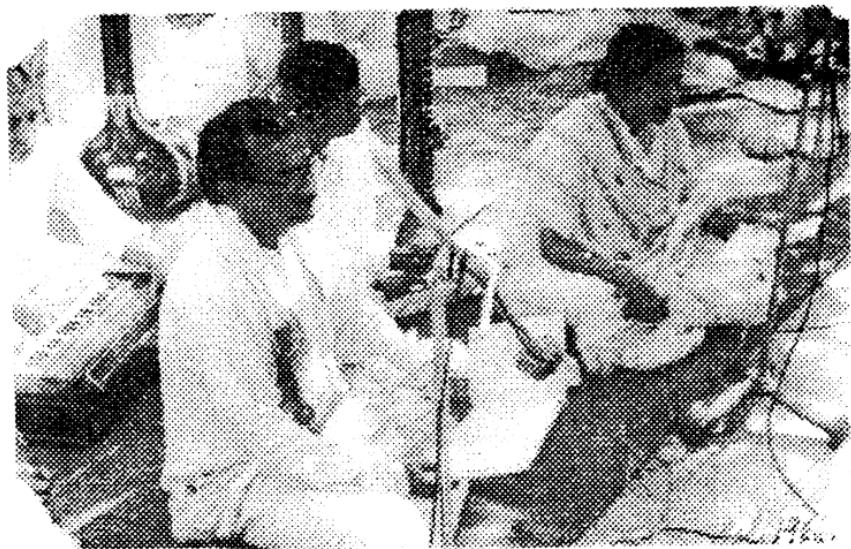
শান্তিদেব ও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

শান্তিদেব ও শান্তিনিকেতন

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলকাতা

শান্তিদেব ও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

শান্তিদেব ও মান্না দে

বিষয়সূচি

ভূমিকা

শান্তিনিকেতনে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট পরিকরবর্গের মধ্যে নিঃসংশয়ে অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব সংগীতাচার্য শান্তিদেব ঘোষ। শ্রীনিকেতন সংগঠনে গুরুদেবের মুখ্য সহযোগী কালীমোহন ঘোষের জ্যেষ্ঠ পুত্র শান্তিদেব ঘোষের সমগ্র জীবনব্যাপী সুরসাধনা গুরুদেবের প্রত্যক্ষ দীক্ষায় গড়ে উঠেছিল বীরভূমের এই লালমাটির বুকে শান্তিনিকেতন আশ্রমে। এই আশ্রমে তাঁর ছাত্রজীবন, অধ্যাপনাপর্ব ও অবসরহীন 'অবসর-জীবন' কেটেছে যেন ফেলে-আসা শতাব্দীর সঙ্গে পায়ে পায়ে এগিয়ে। কোনো দিন তিনি কখনো থেমে থাকেন নি কবির সুরের ধারা বিশ্বময় ছড়িয়ে দেওয়ার সুগভীর সাধনায়। গুরুদেব বলেছিলেন, 'শান্তি তুই কখনো শান্তিনিকেতন ছেড়ে যাস না'। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত কখনো তিনি গুরুবাক্য অমান্য করেন নি। রবীন্দ্রনাথের সুর ও বাণীর ধারক ও বাহকরূপে শান্তিদেব ঘোষের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। শান্তিদেব-নামাঙ্কিত একটি সুন্দর ডাকটিকিটি প্রকাশ করে ভারতীয় ডাকবিভাগ মরণসাগরপারে অমর এই শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। এই ডাকটিকিটটির উদ্বোধন-অনুষ্ঠান আশ্রমপ্রাঙ্গণে হওয়ায় আমরা আনন্দিত। আজ সেইসঙ্গে বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত হল অধ্যাপক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক গৌতম ভট্টাচার্য -সম্পাদিত মূল্যবান একটি গ্রন্থ— 'শান্তিদেব ও শান্তিনিকেতন', যে-বইয়ের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ শান্তিদেব ঘোষের অপ্রকাশিত ডায়ারি। এ বই একই সঙ্গে স্মরণ এবং স্মরণীয় ইতিহাস। গ্রন্থসম্পাদন-পর্বে শান্তিদেবের সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা ইলা ঘোষ মহোদয়ার যে অকৃপণ সহযোগিতা পাওয়া গিয়েছে সেজন্য আমরা কৃতজ্ঞ। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ অক্লান্ত প্রচেষ্টায় স্বল্প সময়ের মধ্যে সুচারুভাবে বইটি প্রকাশ করায় ধন্যবাদার্হ।

সুজিতকুমার বসু
উপাচার্য
বিশ্বভারতী

শান্তিনিকেতন
২৮ নভেম্বর ২০০২

সম্পাদকীয় নিবেদন

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য শিল্প সংগীত সংস্কৃতি এবং সেইসঙ্গে শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীর ইতিহাসে শান্তিদেব ঘোষ একটি স্মরণীয় নাম, এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। গুরুদেবের আসনতলে শান্তিনিকেতনের এই মাটির 'পরে তাঁর আজীবনের সংগীতসাধনা, সৃষ্টিসাধনা। গান গাওয়াটাও যে সৃষ্টিশিল্পের মধ্যে পড়ে— শান্তিদেবের গাওয়া গুরুদেবের গান যিনিই শুনেছেন তিনিই অনুধাবন করেছেন। তাঁর কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের গান নতুন মাত্রা নতুন তাৎপর্য নতুন বিস্ময় নিয়ে দেখা দিত। রবীন্দ্রনাথের গায়কীধারার বোধকরি শেষ প্রত্যক্ষ ধারক ও বাহক ছিলেন শান্তিদেব ঘোষ। যদিও এই বইয়ের নাম 'শান্তিদেব ও শান্তিনিকেতন', এবং যদিও এই বইটিতে শান্তিনিকেতনকে ঘিরেই শান্তিদেবের কথা, তাঁর বহুমুখী প্রতিভার কথা বেশি করে এসেছে ; তথাপি এও আমরা জানি শান্তিদেব ঘোষের প্রতি অনুরাগ-আকর্ষণ শ্রদ্ধা-ভালোবাসা-আবেগ রবীন্দ্রসংগীত অনুরাগী বিশ্বময় ছড়িয়ে থাকা মানুষমাত্রেরই। সুতরাং শান্তিদেব ঘোষকে আরো বৃহত্তর প্রেক্ষিতে অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করা যে অত্যাবশ্যক তা কেউই অস্বীকার করবেন না। সে-কাজ ক্রমে নানাজনের প্রয়াস-প্রযত্নে ভবিষ্যতে নিশ্চয় সম্পাদিত হবে ; কিন্তু শান্তিদেবকে নিয়ে বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত এই প্রথম মুদ্রিত পুস্তকে শান্তিনিকেতনে তাঁকে কাছ থেকে দেখা আশ্রমবাসীদের স্মৃতির একটি সুরম্য কথামালা উপহার দিতে চেয়েছি। আজ যিনি ছিলেন আমাদের কাছে প্রতিদিনের কাছের মানুষ, ইতিহাস তাঁকে পিছন ফিরে খোঁজার জন্য দিশেহারা ব্যাকুল-বিপর্যস্ত হয়। আগামী কালের জন্য ইতিহাসের অনেক উপাদান ও উপকরণ এই বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত রইল।

গ্রন্থসম্পাদনে যাঁর অকুণ্ঠ সহায়তা পেয়ে আমরা কৃতজ্ঞ তিনি শান্তিদেবের সহধর্মিনী শ্রীযুক্তা ইলা ঘোষ মহোদয়া— শান্তিনিকেতনে যিনি আমাদের সকলের পরম শ্রদ্ধেয়া হাসি বৌদি। বিশ্বভারতীর উপাচার্য শ্রীসুজিতকুমার বসু এই গ্রন্থসম্পাদনের দায়িত্ব আমাদের দেওয়ায় আমরা কৃতজ্ঞ। সম্পাদনার নানা পর্বে সানুগ্রহ সহযোগিতা করেছেন শ্রীপূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়। এছাড়াও সাহায্য করেছেন শ্রীশান্তশঙ্কর দাশগুপ্ত ও শ্রীমতী সুপ্রিয়া রায়।

'শান্তিদেব ও শান্তিনিকেতন' বইটির শোভন-সুন্দর প্রকাশনে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীসুধেন্দু মণ্ডল ও কর্মীবৃন্দের তৎপর সযত্ন প্রয়াস সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শান্তিনিকেতন
২৮ নভেম্বর ২০০২

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য
গৌতম ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথের দুটি চিঠি

ওঁ

Kalimpong

কল্যাণীয়েষু

তোমার পিতার মৃত্যু সংবাদে গুরুতর আঘাত পেয়েছি। শান্তিনিকেতনে আসবার পূর্ব থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার নিকট সম্বন্ধ ঘটেছিল। কর্মের সহযোগিতায় ও ভাবের ঐক্যে তাঁর সঙ্গে আমার আত্মীয়তা গভীরভাবে বিস্তার লাভ করেছিল। অকৃত্রিম নিষ্ঠার সঙ্গে আশ্রমের কাছে তিনি আপনার জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর আন্তরিক জনহিতৈষা শ্রীনিকেতনের নানা শুভকর কার্যে নিজেকে সার্থক করেছে। তাঁর স্মৃতি আমাদের আশ্রমে এবং আমার মনের মধ্যে চিরদিনের মত প্রতিষ্ঠিত হয়ে রইল।

লোকহিতব্রত তাঁর যে জীবন ত্যাগের দ্বারা পুণ্যোজ্জ্বল ছিল মৃত্যু তার সত্যকে খর্ব করতে পারে না এই সান্ত্বনা তোমাদের শান্তিদান করুক। ইতি—

১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭

শুভৈষী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু শান্তি,

কেবল দুটি উপদেশ আমার আছে। এই আশ্রমেই তুই মানুষ। সিনেমা প্রভৃতির সংস্পর্শে কোনও গুরুতর লোভেও নিজেকে যদি অশুচি করিস তাহলে আমার প্রতি ও আশ্রমের প্রতি অসম্মানের কলঙ্ক দেওয়া হবে।

দ্বিতীয়, আমার গানের সঞ্চয় তোর কাছে আছে— বিশুদ্ধভাবে সে গানের প্রচার করা তোর কর্তব্য হবে। আমি তোর পিতার পিতৃতুল্য, আশা করি আমার উপদেশ মনে রাখবি।

ইতি
শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ
২১.১.৪১

গুরুদেবের জন্মদিনে আমার কথা

শান্তিদেব ঘোষ

২৫শে বৈশাখ গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের শুভ জন্মদিনটি হল আমাদের জীবনের স্মরণীয় একটি বিশেষ দিন। এই দিনটি হল গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে গুরুদেবকে স্মরণ করার দিন। আজ শান্ত চিত্তে গুরুদেবের জীবনের সত্য পরিচয় নেবার জন্য এই দিনটির প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভব করার দিন। আজকে আমরা তাঁর কাছে প্রার্থনা করব আমাদের প্রতিদিনের বাস্তব কর্মজীবনের লোভ ক্ষোভ ও মোহ থেকে যাতে মুক্তি পেতে পারি, তার জন্য তিনি যেন আমাদের মনে সাহস যোগান। যেন জানতে পারি যে আমাদেরও একটি উন্নত আদর্শ জীবনের প্রয়োজন আছে, কিন্তু সেটি কী? সে বিষয়ে আমরা সহজেই জানতে পারব যদি গুরুদেবের পূর্ণ বিকশিত মনুষ্যত্বের জীবনটির প্রতি একবার দৃষ্টি দিই।

শান্তিনিকেতনের বিদ্যাশ্রমে আমার তিন-চার বৎসর বয়স থেকেই আমি যে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার পরিবেশের মধ্যে বর্ধিত হবার সুযোগ পেয়েছিলাম তা ছিল আমাদের গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ভাবনা-চিন্তা প্রসূত এক যুগান্তকারী শিক্ষা পরিকল্পনা। তাঁর এই নিরাসক্ত কর্মযজ্ঞের সহায়ক হিসেবে তিনি এমন কয়েকজন একান্ত অনুগত শিক্ষকদের সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন যাঁরা গুরুদেবের অধ্যাত্মজীবন, নিরাসক্ত কর্মজীবন এবং নির্মল আনন্দের সাধনার সুষ্ঠু সমন্বয়ে গঠিত তাঁকে এক বিশেষ পুরুষরূপে জেনে গুরুরূপে তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন, বিনা দ্বিধায়। তাঁরা মনেপ্রাণে গুরুদেবকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতেন। তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করতেন গুরুদেবের কর্মকে তাঁদের আন্তরিক কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারা মূর্ত করে তুলতে এখানকার এই বিদ্যাশ্রমে। এইভাবে গুরুদেবের পরিচালনায় এবং তাঁদের সমবেত কর্ম প্রচেষ্টায় শান্তিনিকেতনে জ্ঞান প্রেম কর্ম এবং আনন্দের সমন্বয়ে মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের প্রাণবান যে আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল আমি শিশু বয়স থেকেই তার সঙ্গে যুক্ত হবার সুযোগ পেয়েছিলাম। কিন্তু শৈশবে আমার জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ কতটুকুই বা ঘটেছিল? প্রকৃত গুরুদেবকে জানবার বা চেনবার বোধ আমার মনে কতটুকুই বা জেগেছিল? কিন্তু প্রায় প্রতিদিনই তাঁকে পেয়েছি আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠভাবে, নানা রূপে, নানা কাজে।

দেখেছি তাঁকে নিয়মিত মন্দিরে উপাসনার দিনে আচার্যরূপে। পেয়েছি তাঁকে মাঝে মাঝে আমাদের ক্লাসে শিক্ষকরূপে। আমাদের সাহিত্যসভায়ও যোগ দিতেন সভাপতি পদে। এখানকার বিভিন্ন উৎসবের দিনের অনুষ্ঠানের গান নাচ নাটকের অভিনয়ে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হবার সুযোগ পেয়েছিলাম। আমাদের খেলাধূলায়, আমাদের বাস্তব কর্মজীবনে তাঁর উপস্থিতি আমাদের খুবই প্রেরণা যোগাত।

সে যুগে তিনি যখন অধ্যাপক ও বয়স্ক ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে তাঁর গল্প, উপন্যাস, কাব্য, প্রবন্ধ, নাটক প্রভৃতির পাঠ বা আবৃত্তি করে শোনাতেন বা দেশ-বিদেশের জ্ঞানীগুণী পণ্ডিত ও অধ্যাপকদের সমাবেশে ভাষণ দিতেন বা আলোচনায় বসতেন তাতেও আমাদের যোগদানের কোনো নিষেধ ছিল না। আমাদের মতো বালক-বালিকারা আমাদের ইচ্ছামত এতে উপস্থিত থাকতাম এবং তা শুনতাম। সে বয়সে বুঝতাম না তার অনেক কিছুই। কিন্তু সেখানে বালকোচিত চাঞ্চল্য কখনো আমরা প্রকাশ করতাম না গুরুদেবের উপস্থিতির কারণে। তাঁর উজ্জ্বল ঋষিতুল্য চেহারাই আমাদের মনকে শান্ত সংযত রাখত।

সে যুগে লোকালয় থেকে দূরে নির্জন প্রান্তরে এই বিদ্যাশ্রমকে কেন্দ্র করে যে-সকল অধ্যাপক ছাত্র-ছাত্রী ও কর্মী সমবেত হয়েছিলেন, তাঁদের মনকে সর্বদাই কর্মব্যস্ত এবং আনন্দের পরিবেশের মধ্যে নিযুক্ত রাখবার প্রয়োজনে বিচিত্র উপায়ের উদ্ভাবন তাঁকে করতে হয়েছিল। তাঁকে শৈশবে জানতাম তিনি এই বিদ্যাশ্রমবাসী সমাজের সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ, সকলের শ্রদ্ধেয় বলিষ্ঠ সুন্দর ; একজন বিশেষ মানুষ হিসাবে যিনি এই বিদ্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিচালক। যৌবনে পা দেবার কিছু পরে যখন একটু জ্ঞান-বুদ্ধি হয়েছে তখন যেন গুরুদেবের প্রকৃত স্বরূপ ধীরে ধীরে মনের মধ্যে বিকশিত হতে থাকে। তখন যেন মন বলত, নিশ্চয়ই কোনো-এক মহাপুরুষের আশ্রয়ে আমরা সমবেত হয়েছি।

অল্প বয়েসেই শুনেছি সকলেই তাঁকে 'গুরুদেব' বলছেন। আমিও তাই বলতাম। কিন্তু তখন তা ছিল কেবল আমার মুখের কথা। বড়ো হয়ে তাঁর পরিচয় বেশ খানিকটা পাবার পর গুরুরূপে তাঁকে গ্রহণ করতে আমিও যেন শিখলাম অন্তর থেকে সহজে। তবে একথা বলতেই হবে যে জ্ঞান, প্রেম, নিরাসক্ত কর্ম ও নির্মল আনন্দের সমন্বয়ে পূর্ণ বিকশিত গুরুদেবের জীবনের সঠিক পরিচয় পেয়ে তাঁর মতো আদর্শ জীবনকে যথাযথভাবে গ্রহণ করবার সামর্থ আমি লাভ করি নি। তাঁকে সম্পূর্ণ জানা বা গ্রহণ করা আমার মতো সামান্য মানুষের পক্ষে এক জীবনে কখনই সম্ভব নয়। ভক্ত শিষ্যরূপে তাঁর চরণে আশ্রয় পেয়েও প্রকৃত শিষ্য হতে পারি নি বলে, আমার কোনো দুঃখ নেই। তাঁর গান-নাচ-নাটকের অভিনয়ের এবং উৎসব অনুষ্ঠানের কাজে তিনি আমাকে যে একটু স্থান দিয়েছিলেন, আমাকে নানাভাবে

শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়েছিলেন তাতেই আমি ধন্য। এ-সবের রূপায়ণের জন্য যেমন চেষ্টা করে এসেছি তেমনি চেষ্টা করেছি লেখার দ্বারা আলোচনার দ্বারা তাঁর জীবনের এই কটি দিকের সঠিক পরিচয় পেতে এবং রবীন্দ্রানুরাগীদের কাছে তাঁকে প্রকাশ করতে। একেই আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলে আমি প্রথম গ্রহণ করেছিলাম।

গুরুদেবের কাছ থেকে আরো কিছু পেয়েছিলাম যা আমাকে নির্ভয়ে তাঁর নির্দেশিত পথে এগিয়ে চলতে সাহস জুগিয়েছিল। গুরুতর বিরুদ্ধতার মধ্যেও তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ভক্তি থেকে আমাকে কেউ কখনো টলাতে পারে নি। ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রলোভনে গুরুদেবের নির্দেশকে অমান্য করে ভিন্ন পথে যাবার চিন্তাও কখনো মনে জাগে নি। তাঁর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রেখে তাঁকে নির্ভর করে আমার ক্ষুদ্র সামর্থ মতো তাঁর কাজ করে যেতে পেরেছি বলেই শিক্ষিত দেশবাসীর কাছে গুরুদেবের একজন অন্ধভক্ত হিসাবে পরিচিত হবার সুযোগ আমার ঘটেছে।

গুরুদেব ছিলেন একাধারে ঔপনিষদিক জ্ঞান মার্গের এ যুগের উপযোগী নতুন পথের ব্যাখ্যাতা জ্ঞানযোগী। তিনি ছিলেন মধ্যযুগের ভক্তিমার্গের বৈষ্ণব সাধকদের মতো মরমিয়া নিষ্কাম প্রেমের সাধক। এছাড়া মানব সমাজের সার্বিক উন্নয়নের প্রেরণায় শিলাইদহ অঞ্চলের গ্রাম-সমাজে, শান্তিনিকেতনের বিদ্যাশ্রমে এবং বিশ্বভারতীর কর্মযজ্ঞের জটিলতার মধ্যে বাস করেও তিনি ছিলেন নিরাসক্ত কর্মযোগী। তিনি জ্ঞানের সঙ্গে কর্মযোগের, কর্মযোগের সঙ্গে আনন্দের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে তুলতে পেরেছিলেন নিজের জীবন চর্চার দ্বারা। উপনিষদের আনন্দ মন্ত্রে বলা হয়েছে যে, বিশ্বস্রষ্টার নির্মল আনন্দের দ্বারাই সকল জীবের জন্ম, আনন্দের মধ্যেই সকলের জীবনযাত্রা এবং সেই আনন্দের মধ্যেই সকলের প্রত্যাবর্তন। এই মন্ত্রটি গুরুদেবের জীবনকে নির্মল আনন্দ উপভোগ করবার এবং তা প্রকাশের কাজে তাঁকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। বাল্য বয়স থেকেই উপাসনা মন্দিরে তাঁর অধ্যাত্ম চিন্তামূলক ভাষণগুলি শুনেছি যা তাঁর 'শান্তিনিকেতন' ও 'ধর্ম' নামক গ্রন্থে প্রকাশিত। মধ্য যৌবনে তাঁর 'মানুষের ধর্ম' এবং তাঁর 'The Religion of Man' গ্রন্থের মাধ্যমে ভারতীয় ঔপনিষদিক চিন্তার যুগোপযোগী নতুন ব্যাখ্যাতারূপে তিনি স্বীকৃতি পাবার পর এ কথা সত্য যে এমন একটি বিশ্বাস আমার মনে গেঁথে গিয়েছিল। কিন্তু একই সময়ে তাঁর গানে, নাচে, তাঁর নানাপ্রকার উৎসব-অনুষ্ঠানে তাঁর নানা প্রকারের নাটকের অভিনয়ের দ্বারা আমার কাছে তিনি আর-এক রূপে প্রতিভাত হতেন। এ ছাড়া নির্মল আনন্দযজ্ঞের সাধনায় তিনি তাঁর কাব্য, সাহিত্য, নাটক, গল্প, উপন্যাস ও চিত্রকলার কাজেও যে কতখানি গভীরভাবে নিমগ্ন থাকতেন, তাও দেখেছি।

শান্তিনিকেতনে বা বিশ্বভারতীতে গুরুদেব অধ্যাপক কর্মী ও ছাত্রছাত্রী সমাবেশে

যে মানব সমাজ বা সংসার গড়ে তুলেছিলেন, যেভাবে তাদের সকলকে নিয়ে এখানে তাঁর দিন কাটত তাঁকে কখনোই বলা চলে না নির্ঝঞ্ঝাট শান্তির জীবন। এখানকার এই সমাজের সমস্ত প্রয়োজনের তুচ্ছ অংশটির সম্পর্কেও তাঁকে ভাবতে হত। নিজের হাতে অনেক কিছু করে দেখাতে হত প্রয়োজনে। এই সমাজের সুবিধা অসুবিধাকে, সুখ দুঃখকে তিনি আপন করে নিতে পেরেছিলেন। শান্তিনিকেতনের এই সমাজের সবই যে সহজ ও সুন্দর ছিল তা নয়। এখানে আলোর সঙ্গে আঁধারও ছিল। বিরোধ বিদ্বেষ মাথা চাড়া দিয়ে উঠত প্রায়ই। তার জন্য গুরুদেব নিজেই বলেছিলেন যে, "লোকালয়ের অন্য বিভাগের মতো মন্দের সিংহদ্বার খোলাই আছে। ... সংসারের নানা দাবি, বৈষয়িকতার নানা আড়ম্বর, প্রবৃত্তির নানা চাঞ্চল্য এবং অহং পুরুষের নানা উদ্ধত মূর্তি সর্বদাই দেখতে পাওয়া যায়।" অন্যত্র বলেছিলেন, "অনেকে এখানে এসেছেন, বিচিত্র তাদের শিক্ষা দীক্ষা, সকলকে নিয়েই আমি কাজ করি, কাউকেই বাছাই করি নে, নানা ভুলত্রুটি ঘটে, নানা বিদ্রোহ বিরোধ ঘটে, এ-সব নিয়ে জটিল সংসারে জীবনের যে প্রকাশ, ঘাত-প্রতিঘাতে সর্বদা আন্দোলিত, তাকে আমি সম্মান করি," এই কারণেই তিনি বলতে পেরেছিলেন, "শান্তিনিকেতনের আদর্শ যেমন সত্য সেই আদর্শের ব্যাঘাতও তেমনি সত্য।" এখানকার মানব সমাজে আলোর সঙ্গে আঁধারের আবির্ভাবে গুরুদেব হতাশ হয়ে শান্তিনিকেতনে তাঁর কর্মযজ্ঞের আয়োজনকে অসমাপ্ত রেখে পালিয়ে গিয়ে নির্জনে একাকী বাস করে গান কাব্য ও সাহিত্যের চর্চা অথবা গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীদের মতো মুক্তি বা রসস্বরূপ পরব্রহ্মকে উপলব্ধি করবার সাধনা করতে চান নি। তিনি বিশ্বাস করতেন বাস্তব কর্মজীবনের ভালো-মন্দ আলো-আঁধারের সঙ্গে যুক্ত থেকে পরমানন্দময়ের সাধনাতেই প্রকৃত মুক্তি। সেই কারণেই বলতে পেরেছিলেন সহজে, 'অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়—লভিব মুক্তির স্বাদ।' বলেছিলেন, 'সংসারের তিমিরান্ধকারের মধ্য হতেই আলোকের পথ আবিষ্কার করতে হবে, জ্যোতির্ময় পুরুষকে জানতে হবে।

এইভাবে একই সঙ্গে মানব সমাজের আলো ও আঁধারকে সমমর্যাদায় স্থান দিয়ে গুরুদেব তাঁর শান্তিনিকেতনের কর্মজীবনে অভিনব এক কর্মযোগীর মতো সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন।

গুরুদেবকে যথাযথভাবে জানতে হলে তাঁর জীবন বিকাশের সব কটি দিকের প্রতি সমান দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। কেবল মাত্র কোনো একটি বা দুটি দিকের পরিচয়ে তিনি আমাদের কাছে অসম্পূর্ণ থাকতে বাধ্য। তা না হলে দশজন অন্ধের হস্তিদর্শনের গল্পের মতো তাঁকে আমরা খণ্ডিত ভাবেই বুঝতে বা দেখতে শিখব। তিনি শান্তিনিকেতনের মতো ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে বিদ্যাভবন শিক্ষাভবন পাঠভবন কলাভবন সংগীতভবন এবং পার্শ্ববর্তী দরিদ্র পল্লীবাসীর সামগ্রিক উন্নয়নের জন্যে

শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁর মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশের আদর্শকেই সামনে রেখে। এই বিষয়ে পরিষ্কার করে বোঝাতে গিয়ে তিনি অন্যত্র বলেছেন, 'আমি স্বভাবতই সর্বাস্তিবাদী অর্থাৎ আমাকে ডাকে, সকলে মিলে, আমি সমগ্রকেই মানি। সমস্তের মধ্যে সহজে সঞ্চরণ করে সমস্তর ভিতর থেকে আমার আত্মা সত্যের স্পর্শ লাভ করে সার্থক হতে পারবে। বিশ্বে সত্যের যে বিরাট বৈচিত্র্যের মধ্যে আমরা স্থান পেয়েছি তাকে কোনো আড়াল তুলে খণ্ডিত করলে আত্মাকে বঞ্চিত করা হবে, এই আমার বিশ্বাস। যদি এই বিরাট সমগ্রের মধ্যে সহজ বিহার রক্ষা করে চলতে পারি তবে নিজের অগোচরে স্বতই পরিণতির পথে এগোতে পারব। আমি নানা কিছুকেই নিয়ে আছি নানা ভাবেই, নানা দিকেই নিজেকে প্রকাশ করতে আমার ঔৎসুক্য। বাইরে থেকে লোক মনে ভাবে তাদের মধ্যে অসংগতি আছে আমি তা অনুভব করি নে। আমি নাচি গাই লিখি আঁকি ছেলে পড়াই গাছপালা আকাশ আলোক জল স্থল থেকে আনন্দ কুড়িয়ে বেড়াই। কঠিন বাধা আসে লোকালয় থেকে, এত জটিলতা এত বিরোধ বিশ্বে আর কোথাও নেই। সেই বিরোধ কাটিয়ে উঠতে হবে, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমার এই চেষ্টার অবসান হবে না।'আমার নিজের ভিতর থেকে আশ্রমে যদি কোনো আদর্শ কিছু মাত্র জেগে থাকে তবে সে আদর্শ বিশ্ব সত্যের অবারিত বৈচিত্র্য নিয়ে। এই কারণেই কোনো একটা সংকীর্ণ ফল হাতে হাতে দেখিয়ে লোকের মন ভোলাতে পারব না। এই কারণেই লোকের আনুকূল্য এতই দুর্লভ হয়েছে এবং এই কারণেই আমার পথ এত বাধাসংকুল। একদিকে পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী থেকে আরম্ভ করে সুরুলের দরিদ্র চাষী পর্যন্ত, সকলেরই জন্যে আমাদের সাধন ক্ষেত্রে স্থান করে দিতে হয়েছে সকলেই যদি আপনাকে প্রকাশ করতে পায় তবেই এই আশ্রমের প্রকাশ সম্পূর্ণ হতে পারবে— তিব্বতী লামা এবং নাচের শিক্ষক কাউকে বাদ দিতে পারলুম না।"

শান্তিনিকেতনের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার সঙ্গে দীর্ঘকাল জড়িত থেকে গুরুদেবকে আমি যেভাবে দেখেছিলাম বা বুঝেছিলাম তাঁর স্মৃতি আহরণ করে আজ নিঃসংশয়ে বলতে পারি যে সর্বাস্তবাদী সার্থক সাধক হিসাবে আমার কাছে তিনি যে রূপে প্রতিভাসিত হয়েছিলেন তার পরিচয় পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। এ পথে তিনি এক এবং অদ্বিতীয়।

১৩৮০ সনের ২৫ বৈশাখ (১৯৭৩-এর ৮ মে) শান্তিনিকেতন মন্দিরে অনুষ্ঠিত উপাসনায় প্রদত্ত আচার্যের ভাষণ।

শান্তিনিকেতন যতটা শান্তিদাকে পেয়েছে আর কাউকে এতটা পায় নি

অমিতা সেন

গুরুদেব বলেছিলেন শান্তি তুই কখনো শান্তিনিকেতন ছেড়ে যাস না। শান্তিদা আন্তরিক শ্রদ্ধাসহ তাঁর ইচ্ছা পূরণ করতে পেরেছেন। গুরুদেব যখন চলে গেছেন তখন একবার শালবীথিতে 'ফাল্গুনী' নাটকটি হ'ল। অন্ধ বাউলের যে অভিনয় গুরুদেব করতেন সেটা শান্তিদা করেছিলেন। তখন সেই অভিনয় দেখে আমার মা আশ্রমের 'ঠানদি' কিরণবালা সেন পরদিনই সক্কালবেলা শান্তিদার বাড়িতে গিয়ে বলেছিলেন— 'ওরে শান্তি, তুই তো কাল গুরুদেবকে ফিরিয়ে এনেছিলি— কী অসাধারণ তোর অভিনয়!' শান্তিদা খুব খুশি হয়ে 'ঠানদি'কে প্রণাম করলেন। বাড়ির সকলকে ডেকে এনে ঠানদিকে প্রণাম করতে বললেন। 'ঠানদি'র এই উক্তির মধ্যে শান্তিদাকে আমরা চিনতে পারি, বুঝতে পারি— শান্তিদার গুণের বৈশিষ্ট্য এখানে আমরা উপলব্ধি করতে পারি। একলব্যের মতো তাঁর ছিল রবীন্দ্র সাধনা।

কোনো অর্থের, যশের লোভে শান্তিদা ২৫শে বৈশাখ কোনোদিন শান্তিনিকেতন ছেড়ে যান নি। দেশবিদেশের কত কত প্রতিষ্ঠান থেকে ২৫শে বৈশাখে শান্তিদাকে আমন্ত্রণ করেছেন, অনেক অনুনয়-বিনয় করেও শান্তিদাকে তাঁরা শান্তিনিকেতন থেকে নিয়ে যেতে পারেন নি। ২৫শে বৈশাখ বিকেল বেলায় উত্তরায়নে উদয়নের বারান্দায় বসে একটার পর একটা রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে চলতেন— কে এল, কে গেল কোনোদিকে তাঁর খেয়াল থাকত না— এ যেন তাঁর আশ্রমগুরুকে গানের আরতি। গুরুদেবের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধায় কোনোদিনও ছেদ পড়ে নি— এমনই ছিল শান্তিদার Dedication।

সেই সেকালে কোণার্কের বারান্দায় প্রতিমা বৌঠান বসে আমাকে নাচের নির্দেশ দিচ্ছেন। শান্তিদা পাশে বসে গান করছেন। মাঝে মাঝেই নাচের মধ্যে শান্তিদা প্রতিমা বৌঠান যেভাবে আমাকে বলছেন শান্তিদাও ঠিক সেইভাবে আমাকে এইরকম কর ওইরকম কর বলে·টিপ্পনি কাটছেন— তখনো আমার শান্তিদাকে ঝাঁঝিয়ে কথা বলবার সাহস ছিল। আমি বললাম টিপ্পনি না কেটে নিজে এসে নাচো দেখি... উত্তরে

বলেছিলেন আমি যদি নাচতাম তাহলে তোমার থেকে অনেক ভালো নাচতাম... এই কথাটা বৌঠানের মনকে খুব নাড়া দিল— বললেন— 'এটা তো বেশ হয় রে শান্তি, তুই অমিতার সঙ্গে নাচ।' নেচেছিলেন আম্রকুঞ্জে আমার সঙ্গে— শান্তিদার এটাই প্রথম নাচ 'হৃদয় আমার... ওই ওই ওই বুঝি তোর বৈশাখী ঝড়...' পরবর্তীকালে নৃত্যে তো তিনি শীর্ষে চলে গেলেন, কিন্তু আমার সঙ্গে আম্রকুঞ্জে প্রথম নৃত্যে হাত হয়ত পা হয় না...।

আমার শেষ অভিনয় 'শাপমোচন'-এ রানীর ভূমিকায়। মহড়া শুরু হয়েছিল, রাজার ভূমিকায় শান্তিদাই। কলকাতা যাবার আগেই শান্তিদার হয়ে গেল 'হাম'। তাই ডাঃ টিম্বার্সকে গুরুদেব রাজার ভূমিকায় অভিনয় শিখিয়ে দিলেন। আমি শান্তিদাকে তাঁর প্রথম নাচে আমার সঙ্গে যেমন পেয়েছিলাম তেমনি কিন্তু আমার শেষ অভিনয় 'শাপমোচন'-এ শান্তিদাকে রাজার ভূমিকায় পেতে পেতেও হারালাম।

আমি পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছি— যখনই যেখানে শান্তিদার রেকর্ড শুনেছি মন মুহূর্তে চলে যেত আমাদের সব হতে আপন শান্তিনিকেতনে। যেমন বসন্তে মহানিমফুলের গন্ধে আমাদের মনকে মাতিয়ে তুলত— যেখানেই মহানিমফুলের গন্ধ পেয়েছি খুঁজে বেড়িয়েছি। এখানে শান্তিনিকেতন-শান্তিনিকেতন গন্ধ কোথা থেকে এল।

শান্তিদা তাঁর পিতা কালীমোহন ঘোষের মতো পারিবারিক বন্ধনটিকে কোনোদিন আলগা হতে দেন নি। খুড়িমা মনোরমা দেবী শান্তি, সাগর, সমীর, সলিল, মন্টু, ভুলু ছয় পুত্র ও একটিমাত্র কন্যা সুজাতা (বুড়ি)কে নিয়ে ছিল তাঁদের যৌথ পরিবার। নিরাশ্রয় আত্মীয়া বালবিধবাদের সাদরে পরিবারভুক্ত করে নিয়েছিলেন কালীমোহন ঘোষ। খুড়িমা যেমন আদর্শ গৃহিণী ছিলেন তেমনি ছিলেন তেজস্বিনী... মতামত ছিল তাঁর খুবই দৃঢ়। একবার কোনো পারিবারিক কারণে তিনি আঘাত পেয়ে চলে গিয়েছিলেন বোম্বাইতে ছেলের (সলিল) কাছে। কিন্তু তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেন নি। এই ব্যাপারটিতে শান্তিদা অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন এবং দুঃখও পেয়েছিলেন— এ দুঃখ নিজের মনের মধ্যেই রেখেছিলেন কখনো প্রকাশ করেন নি। প্রকাশ পেল যখন খুড়িমা ফিরে এলেন শান্তিনিকেতনে। শান্তিদা বাড়ি এসে দেখেন খুড়িমা বারান্দায় বসে আছেন। তখন শান্তিদা শুধু গম্ভীর সুরে বলেছিলেন —'ফিরে এসেছো, ব্যাস্ আর কখনো কোথাও যেও না।' শান্তিদা জীবনভোর সাধারণ জীবনযাপন করে গেছেন— সামর্থ থাকা সত্ত্বেও Life styleটা এতটুকু বদল হয় নি— সেই মাটির ঘর, সেই টিনের চালা, সেই পিঁড়ি পেতে খাওয়া সব কিছুই সাবেকি ঐতিহ্য...।

শান্তিদা তো শান্তিনিকেতনকে প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেছেন— শান্তিদা ছাড়া

শান্তিনিকেতনকে তো কল্পনাই করতে পারি না। শান্তিনিকেতনে কখনো যদি আশ্রম-আদর্শ বিরোধী ঘটনা নজরে পড়ত তখনই রুখে দাঁড়াতেন— প্রতিবাদ করতে দ্বিধা করতেন না। কোনো কাজে আবেদন পত্রে শান্তিদা সই করলেই ঠিক তার পরের জায়গাটি ফাঁক রেখে বলতেন, "এখানে অমিতা সই করবে।" শান্তিদার ৮০তম জন্মদিনে শান্তিদার বাড়িতেই পাত পেড়ে খাওয়ার বিরাট আয়োজন হয়েছিল। শান্তিদা বারান্দায় বসে থেকে থেকেই জিজ্ঞাসা করছিলেন— অমিতা, যমুনাকে ভালো করে খাওয়াচ্ছ তো? ওরা মাংস পেয়েছে তো...।

লোক সংস্কৃতিকে উজ্জীবিত করে সকলের সামনে তুলে ধরলেন তো একমাত্র শান্তিদাই। আজ পৌষ উৎসবে নানাবিধ লোকসংস্কৃতির অনুষ্ঠান যে এত মর্যাদা পাচ্ছে তা কার চেষ্টায়? এর পিছনে তো আমাদের প্রিয় শান্তিদাই— ২৪ বৈশাখ খুব ভোরবেলায় ফুল, চন্দন আর মিষ্টি হাতে যেতাম শান্তিদার বাড়িতে। প্রণাম করে তাঁর কপালে ফোঁটা পরিয়ে মিষ্টি খাওয়াতাম। তাই তো তিনি বলতেন— "অমিতা, তুমি ছাড়া আমার জন্মদিন কেউ জানে না।" আমরা দু'জনেই আশ্রমিক। আমাদের শারীরিক শক্তি কমলেও ভালোবাসার বন্ধন দিনে দিনে বেড়েই চলেছিল। ফোনে শান্তিদা বলতেন— "তুমি অমিতা, প্রতি বছর আমার জন্মদিনে এসে ফোঁটা দিয়ে আমায় মিষ্টি খাইয়ে যেতে। তুমি ছাড়া আমার জন্মদিন আর কেউ জানে না। আর তো তুমি আমার কাছে আসতে পারবে না, ফুল আর চন্দনের ফোঁটা দিতে।" টেলিফোনেই তাঁর মনের কথা জানাতেন।

তখন শান্তিদা আর আমি চলা-ফেরার শক্তি হারিয়েছি। শুধু বাড়িতেই বন্ধ বলা যথেষ্ট নয়, প্রায় বিছানাতেই বন্দী। তারই মধ্যে প্রায়ই শান্তিদার কাছ থেকে ফোন আসত— সেই-সব মর্মস্পর্শী কথা কি লিখে বোঝানো যায়? যায় না...। আমাকে ফোন করেই উনি গেয়ে উঠতেন— 'আমি শুধু রইনু বাকি...' আমিও যে চলৎশক্তি হারিয়েছি— এ গান শুনলেই আমারো মন কেঁদে উঠত।

অনুলিখন : অরবিন্দ নন্দী

রবি-বীণার কুশলী কলাবিদ্

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

"সুরের আলো ভুবন ফেলে ছেয়ে,
সুরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে,"

—গানের এই কলিটির মধ্যে যে কী তাৎপর্য রয়েছে তা বোঝবার বয়স হয় নি শৈশবে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে উপলব্ধি করলাম বাস্তব জগতে চলার পথে সুর এবং ছন্দকে বাদ দিয়ে চলা যায় না। এর প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই আমাদের জীবনেব সূক্ষ্ম পথটির সন্ধান দেয়। প্রতিদিনকার কর্মজগতের শৃঙ্খলার মধ্যেও কিছুটা থাকে চিরাচরিত পদ্ধতি, কিছুটা থাকে স্নিগ্ধতার ছোঁয়া। এই স্নিগ্ধতাই আমাদের শরীর মনকে সতেজ করে। গুরুদেবের পরিকল্পিত শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে সংগীত একটি বিশেষ বিষয়। সকলের কণ্ঠে সুর না থাকতে পারে, কিন্তু সূক্ষ্ম অনুভূতি জাগিয়ে তোলে আশ্রম বিদ্যালয়ের গুরু এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে। আমার জ্ঞান হওয়ার পর থেকে যাঁর সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য হয়েছিল তিনি গুরুদেবের সকল গানের ভাণ্ডারী এবং কাণ্ডারী শ্রদ্ধেয় দিনেন্দ্রনাথ। তাঁর উচ্চাসনের একধাপ পরেই ছিলেন শান্তিদা (শান্তিদেব ঘোষ), নুটুদি (রমা কর) এবং খুকুদি (অমিতা সেন)। অনাদিদা (অনাদিকুমার দস্তিদার) তখন কলকাতাবাসী। মাঝে মাঝে তাঁকে আশ্রমে আসতে দেখতাম। পারিবারিক দিক দিয়ে শান্তিদার সঙ্গে আমাদের কিছুটা যোগসূত্র ছিল। আমার ঠাকুমার বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন শান্তিদার পিতৃদেব শ্রদ্ধেয় কালীমোহন ঘোষ। তাকে নিজ পুত্রসম দেখতেন ঠাকুমা। সেই সুবাদে আমার পিতৃদেব প্রভাতকুমারের কাছে নিজ অগ্রজসম স্থানই ছিল শ্রদ্ধেয় কালীমোহনের। আমাদের তৎকালীন পরিবারে তিনি ছিলেন সর্বজ্যেষ্ঠরূপে। শ্রদ্ধেয় কালীমোহন আমার ঠাকুমাকে মাতৃ-সম্বোধন করতেন।

স্মৃতি কিছুটা অস্পষ্ট হয়ে গেলেও মনে আছে কোনো অনুষ্ঠানের পর আমরা গোরুর গাড়িতে ফিরছি শ্রীনিকেতন থেকে। শান্তিদা তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে গান গাইতে গাইতে চলেছেন গাড়ির পাশে পাশে। গানটি হচ্ছে 'আকাশ জুড়ে শুনিনু'। সেই নক্ষত্রখচিত আকাশের নীচে আমাদের মন্থর গোরুর গাড়ির মধ্যে বসে আমরা শিশুর দল যেন কোনো স্বপ্নলোকে চলে গেলাম। শান্তিদার তখন তরুণ বয়স, কণ্ঠ সতেজ

এবং দৃপ্ত। এর পরেও দেখেছি দোলপূর্ণিমার দিনে সন্তোষালয়ের সামনে অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং সহজ পরিবেশে শান্তিদা নাচছেন সমবেত আশ্রমিকদের গানের সঙ্গে।

১৯৪১ সালের শেষ জন্মদিনে গুরুদেব রয়েছেন অসুস্থ অবস্থায় উত্তরায়ণে। আশ্রমে তখন গ্রীষ্মাবকাশের জন্য বাসিন্দা খুবই কম। শান্তিদার উদ্যোগে আমরা কয়েকজন (তার মধ্যে আমার মাসতুতো ভাই জয়ন্তও ছিল) 'ওই মহামানব আসে' গানটি রপ্ত করলাম এবং ঐ দিন ভোরের প্রায় আলো আঁধারির মধ্যে আমাদের বৈতালিক দল গুরুদেবকে প্রণাম জানাতে গেলাম। গুরুদেবের মৃত্যুর পরের বছর 'বাল্মীকি প্রতিভা'র অভিনয়ের প্রস্তুতি চলছে। শান্তিদা বাল্মীকির ভূমিকায়। সংগীতে সহযোগিতা করার জন্য পিয়ানোয় বসেছেন ইন্দিরা দেবী। আমারো দস্যুদলের মধ্যে অংশ নেবার সৌভাগ্য হয়েছিল। একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে আমার মাসতুতো ভাই জয়ন্তর আগ্রহে আমরা দুজনে অনেকগুলি গান শিখেছিলাম শান্তিদার কাছে। নিজস্ব এস্রাজটি নিয়ে অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে বেশ কতকগুলি গান শিখিয়েছিলেন খুবই যত্ন করে। তার মধ্যে মনে আছে— 'আমার প্রিয়ার ছায়া আকাশে আজ ভাসে,' 'আমার যেদিন ভেসে গেছে,' 'এসেছিলে তবু আস নাই জানায়ে গেলে'— প্রভৃতি। বছর আষ্টেক আগে আমি একটি পরিকল্পনা নিলাম যে শান্তিদার একটা পোট্রেট আঁকব। ফোনে জানাতেই খুশি হয়ে সম্মতি দিলেন। হাসি বৌদির জলযোগের আয়োজনের এবং শান্তিদার সরস গল্পের মধ্যে আমি আমার ছবিটি শেষ করলাম। প্রশংসা পেয়ে যথেষ্টই তৃপ্তিলাভ করলাম।

১৯৯০ সালে আমার পিতৃদেবের জন্মস্থান রানাঘাটের রবীন্দ্রভবনে তাঁর একটি আবক্ষ মূর্তির আবরণ উন্মোচন করা হবে। রানাঘাটবাসী-কর্মকর্তাদের অনুরোধে শান্তিদা মূর্তির আবরণ উন্মোচন করতে রাজি হলেন অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে। পিতৃদেবের জন্মদিনে (১১ শ্রাবণ) আবরণ উন্মোচিত হল রানাঘাটের রবীন্দ্রভবনে। উপস্থিত অনেকের অনুরোধে শান্তিদা গাইলেন— 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি।' মূর্তিটির নির্মাতা কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত ভাস্কর গণেশ পাল। সেদিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীযুক্ত নিমাইসাধন বসু ও রানাঘাটের সুসন্তান নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত।

লোকসংগীতের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল,— এ কথাও সকলেই জানেন। গ্রাম গঞ্জের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগাযোগ যেন তাঁর পিতৃদেবের ধারাকেই বজায় রেখেছিল। গুরুদেবের সংগীতের সার্থক ধারক হিসাবে তিনি চিরকালই আমাদের প্রণম্য। নৃত্যশিল্পের প্রচলনেও তাঁর অবদান রয়েছে যথেষ্ট।

রবীন্দ্র-সুরের বীণা
ঝংকৃত তব কণ্ঠ মাঝে
সংগীত তান তব
চিত্তমাঝে নিত্য যেন বাজে।

আমাদের শান্তিদা

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

দেখা হোক না হোক শান্তিদা 'আছেন' এটাই ছিল আমাদের সবার ভরসা। আজ মনে হচ্ছে মাথার উপর আর কেউ নেই। রবীন্দ্র-সংগীত জগৎ শূন্য হল। কিছুদিন আগেই আমার গুরু শ্রদ্ধেয় শৈলজাদা (শৈলজারঞ্জন মজুমদার) চলে গেলেন। আজ আমার আর-এক শিক্ষাগুরু শান্তিদাও চলে গেলেন।

সেই কোন্ ছোটোবেলা থেকে শান্তিদার সঙ্গে আমার পরিচয়। তাঁর কাছে কত রকমভাবে গান শিখেছি— তাঁর সঙ্গ করেছি। সংগীত জগৎ, পারিবারিক জগৎ ছাড়াও কর্মজগতে আমি তাঁকে খুবই কাছাকাছি পেয়েছি। তাঁর কোমল কঠোর স্বভাব কখনো হাসিয়েছে, কখনো কাঁদিয়েছে। কিন্তু তাঁর অনাবিল স্নেহ চিরকাল পেয়ে এসেছি।

এই তো গত বছর আমি ও শান্তিদা একই সঙ্গে অসুস্থ হয়েছিলাম। সরকারি উদ্যোগে আমাদের দুজনকেই পি. জি. হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। পাশাপাশি ঘরে দুজনেই থাকতাম। ওখানে অত শারীরিক অসুস্থতার মধ্যেও দুজনে দুই ঘরে পাশাপাশি থাকার একটা আনন্দ ছিল। শান্তিদার কাছে যাঁরা আসতেন, তাঁরা আমাকে দেখতে আসতেন। আমার কাছে যাঁরা আসতেন, তাঁরা শান্তিদাকে দেখতে যেতেন। সব সময় হাসিদিকে দিয়ে আমার খবর নিতেন। এর মধ্যে দুজনের জর্দা খাওয়া চলত। শান্তিনিকেতনে দুজনেই ফিরে এলাম। খবর পেতাম, শান্তিদা নিয়মিত রিক্‌শা করে আশ্রমে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আর আমি সেই থেকে একটি চেয়ারে বসেই আছি। শান্তিদাকে বয়স ছুঁতে পারে নি। আমি অহরহ শান্তিদার কথা ভাবি।

অগ্রজপ্রতিম

পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়

১৯৫৫ থেকে আমি শান্তিদেব এবং তাঁর পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। তখনকার শান্তিনিকেতনে শান্তিদেবের কনিষ্ঠ অনুজ শুভময় এবং তাঁর দুই বন্ধু বিশ্বজিৎ রায় আর অমিতাভ চৌধুরী— এই ত্রয়ী যুবকের প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল সুবিদিত। অপরিহার্য ছিল সাহিত্যসভায়, নাটকে, নাচ-গানের অনুষ্ঠানে, খেলার মাঠে, কালোর দোকানে, বনভোজনে কিংবা বার্ষিকভ্রমণে এই ত্রয়ীর উপস্থিতি। শুভময় ছিলেন সর্বজনপ্রিয় ভুলু। সেই ভুলুদা'র স্নেহময় ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ আমি অচিরে জড়িয়ে পড়েছিলাম ঘোষ-পরিবারের সুখ-দুঃখের সঙ্গে যা আজও অব্যাহত। ফলে, খুব কাছে থেকেই শান্তিদাকে জানার সুযোগ হয়েছে আমার। গান-নাচ-নাটক কোনো ক্ষেত্রেই আমার বিন্দুমাত্র স্বাভাবিক-সহজাত প্রবণতা, ক্ষমতা বা দক্ষতা নেই। তাই শিল্পীরূপে নয়, তাঁকে আমি দেখেছি এক অসাধারণ ব্যক্তি বা মানুষরূপে। সুদীর্ঘকাল তাঁর সান্নিধ্যে থাকলেও সামান্য সুরও আমার গলা থেকে কোনো দিন বেরয়নি— তাতে আমার আক্ষেপও নেই। কেন না, মানুষ শান্তিদেবের মধ্যে যা দেখেছি— যা পেয়েছি তার তুলনা মেলা ভার।

শান্তিদেবকে আমি নানা ভূমিকায় দেখেছি— ঘরোয়া সংসারীরূপে, স্বামী-পুত্র জ্যেষ্ঠভ্রাতা এবং জ্যেষ্ঠতাতরূপে। সর্বোপরি একনিষ্ঠ রবীন্দ্র-শিষ্যরূপে তো বটেই। আর, ব্যক্তিগতভাবে আমি এবং আমার পরিবার তাঁকে জেনেছি পরমহিতৈষী অভিভাবকরূপে। শান্তিদা এবং তাঁর স্ত্রী হাসিবৌদি হয়ে উঠেছেন অত্যন্ত আপনজন —নিকট আত্মীয় তুল্য। অভিভাবকের মতোই আমাদের ভাইবোনদের সংসার জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁরা। জীবনের নানা পর্বে— সুখের দিনে কিংবা দুখের রাতে পেয়েছি তাঁদের শুভেচ্ছা নতুবা সান্ত্বনা। নানা সংকটে জুগিয়েছেন সাহস ও মনোবল।

শান্তিদার জীবনের দুটি দিক গভীরভাবে প্রাণিত করেছে আমাকে। অনেকবার তাঁর মুখে শুনেছি আর্থিক অসচ্ছলতার মধ্যেও স্বীয় আদর্শে ও বিশ্বাসে অবিচল থাকার কথা। কখনো মাথা নত করেন নি প্রবলের কাছে, ক্ষমতালোভীর কাছে।

বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ তাঁর এই ব্যক্তিত্ব সহ্য করতে না পেরে পঞ্চাশের দশকে একবার কর্মচ্যুত করেছেন শান্তিদেবকে। সংঘাত গড়িয়েছিল বহুদূর— তৎকালীন আচার্য-প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু পর্যন্ত বিব্রত হয়েছিলেন সেই ঘটনায়। অনতিকালের মধ্যেই রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের প্রাক্কালে সংগীতভবন আর শান্তিনিকেতনের সাংস্কৃতিক জীবনে শান্তিদার অপরিহরণীয় গুরুত্বের দিকটি উপলব্ধি করে সসম্মানে ফিরিয়ে এনেছেন তাঁকে। তাঁর চরিত্রের এই ঋজুতা অননুকরণীয় দৃষ্টান্ত বলে মনে হয়েছে আমার কাছে— বিশেষ করে এ-যুগের শান্তিনিকেতনে এই চারিত্রিক-দৃঢ়তা অকল্পনীয়।

দ্বিতীয়ত, মুগ্ধ হয়েছি তাঁর জ্ঞানস্পৃহা এবং অধ্যয়নের ব্যাপক ব্যবস্থা দেখে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গতানুগতিক ডিগ্রি না থাকলেও রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ হিসেবে শান্তিদা প্রতিষ্ঠিত করেছেন নিজেকে— দেশের সারস্বত সমাজে তা স্বীকৃত হয়েছে। আকরগ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছে সংগীত-নৃত্য-অভিনয় সম্বন্ধে তাঁর গ্রন্থগুলি। রবীন্দ্রনাথের গান সম্বন্ধে ভবিষ্যতে যাঁরা গবেষণা করবেন, শান্তিদেবের 'রবীন্দ্র-সংগীত'-এর শরণ তাঁদের নিতেই হবে। বহুবার নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছেন, কেবল ক্লাসে পড়ানো কিংবা উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখাই যথেষ্ট নয়, লেখাপড়া ও গবেষণার মধ্যে দিয়ে নিজের উদ্‌বৃত্ত শক্তিকে বিকশিত করাও বিশ্বভারতীর শিক্ষকদের অন্যতম কর্তব্য। গুরুদেবেরও সেই প্রত্যাশা ছিল। শান্তিদার এই উপদেশ ব্যক্তিগতভাবে যথাসাধ্য পালনের চেষ্টা করেছি আমি।

পিতা কালীমোহনের আকস্মিক মৃত্যুর পর ভাই-বোন এবং আশ্রিত-আত্মীয় ভরা সংসারের দায়িত্ব বহন করেছেন শান্তিদেব। নিঃসন্তান হলেও অকালপ্রয়াত কনিষ্ঠ ভ্রাতা শুভময়ের একমাত্র সন্তান শমীককে পিতার অভাব বুঝতে দেন নি। বাড়িতে অতিথি-অভ্যাগতের বিরাম ছিল না। মধ্যম ভ্রাতা সাগরময়ের সূত্রে কবি-সাহিত্যিক-সাংবাদিকের আনাগোনা তো ছিলই, সেইসঙ্গে শান্তিদার আকর্ষণে গাইয়ে-বাজিয়ে, বাউল-ফকিরদের অতিথিশালা হয়ে উঠেছিল তাঁর শ্রীপল্লীর বাড়ি। তাঁরা সকলেই শান্তিদেব-পরিবারের প্রীতিভরা আতিথ্যে এবং সৌজন্যে মুগ্ধ হয়েছেন। উল্লেখ্য, সংগীতভবনের সঙ্গে যুক্ত থাকাকালে এ যুগের মতো টিউশন দিয়ে কিংবা বাইরে গান গেয়ে কোনোরকম অর্থোপার্জনের চেষ্টা তিনি করেন নি। সেরকম মানসিকতাই শান্তিদার ছিল না। চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর সাংসারিক কারণে বাধ্য হয়েছেন সম্মান-দক্ষিণা নিতে। সে ক্ষেত্রেও একালের শিল্পীদের মতো কোনো 'রেট' তাঁর ছিল না। তাঁর এই ঔদার্যের সুযোগ নিয়েছেন অনেকেই।

কেবল আপনজন কিংবা পারিবারিক বন্ধুদের প্রতি নয়, অত্যন্ত সাধারণ মানুষ বিশেষ করে গরিব দুঃখীদের জন্যও তাঁর দরদ লক্ষ করেছি। রিকশাচালক থেকে

বাউল-ফকির সকলের জন্যই ছিল তাঁর অপরিমেয় ভালোবাসা। শান্তিদেবের বাউল-ফকির প্রীতি সুবিদিত। দিনের পর দিন তাঁদের বাড়ির দক্ষিণের বারান্দায় আশ্রয় নিয়ে ধুনি জ্বেলে গান গেয়েছেন বাউল-শ্রেষ্ঠ নবনীদাস। তাই শেষ শয্যায় শায়িত শান্তিদেবের পাশে দাঁড়িয়ে নবনী-পুত্র শোক-বিহ্বল পূর্ণদাস সেদিন বলেছেন, 'আমরা বাউল সম্প্রদায়ের জনককে হারালাম।' শুধু বাউল কেন, লোকসংস্কৃতির চর্চায় যিনিই নিযুক্ত, তিনি কীর্তনীয়াই হোন আর লেটোগানের গায়কই হোন, সকলেরই অনুরাগী শান্তিদেব। ইংল্যান্ডবাসিনী রবীন্দ্র-সংগীত গায়িকা রাজেশ্বরী দত্ত এসেছেন শান্তিনিকেতনে। সবচেয়ে গুণী কীর্তনীয়ার সঙ্গে পরিচিত হতে চান— শরণ নিলেন শান্তিদার। মুর্শিদাবাদ জেলার সালারের কাছে দো-পুখুরিয়া গ্রামে কীর্তনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গায়ক নন্দকিশোরের নিবাস। শান্তিনিকেতন থেকে সোজাসুজি তখন পৌঁছনো যেত না সেখানে। কিছুটা ট্রেনে, কিছুটা বাসে যেতে হত। সত্তর বছরের শান্তিদা হাসিবৌদি ও রাজেশ্বরী দেবীকে নিয়ে বেশ কষ্ট করেই গেলেন সেখানে। পথের কষ্ট, গ্রামের বাড়িতে থাকার নানা অসুবিধা— কোনো কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়াল না। এমনভাবেই ঘুরে এসেছেন বীরভূমের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কীর্তনীয়াদের গ্রাম ময়নাডাল।

প্রথম জীবনে গুরুদেবের নির্দেশে ও প্রেরণায় জাভা-বালি, কেরল কিংবা তৎকালীন সিংহলে (শ্রীলঙ্কা) গিয়ে শান্তিদেবের নৃত্যানুশীলনের কথা সকলেরই জানা। কিন্তু লোকসংস্কৃতি ও শিল্পের সন্ধানে তিনি যে বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান কিংবা মুর্শিদাবাদের গ্রামে গ্রামে পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়িয়েছেন তা অনেকেই জানেন না। (এ ব্যাপারে তাঁর দুই আচার্য— ক্ষিতিমোহন সেন ও নন্দলাল বসু ছিলেন তাঁর প্রেরণার উৎস।) ওই একই আকর্ষণে বছরের পর বছর শান্তিদা ও হাসিবৌদি (ছায়ার মতোই যিনি স্বামী-অনুগামিনী) গেছেন কেঁদুলির জয়দেব-মেলায়, বীরভূম-বর্ধমানের সীমান্তে দধিয়ার বৈরাগীতলার মেলায়। সেখানে বাউল-বৈষ্ণবদের আখড়ায় তাঁদের জন্য আসন পাতাই থাকত। সিউড়ির কাছে পাথরচাপড়ি ও কুষ্টিকুরির মুসলিম-ফকিরদের মেলাতেও তাঁদের উপস্থিতি আবশ্যিক হয়ে উঠেছিল। বার্ধক্য বা অসুস্থতার দোহাই তিনি মানতেন না। বিরক্ত হতেন তাতে। এ-সব মেলায় কোনো কোনো বছর আমিও তাঁদের সঙ্গী হয়েছি। রাত্রির মধ্যপ্রহরে কেঁদুলিতে অজয়ের পাড়ে কনকনে শীতে বটগাছের তলায় তন্ময় হয়ে বাউল গান শুনছেন শান্তিদা —সেই দৃশ্য আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে।

লোকসংগীত ও নৃত্যের প্রতি শান্তিদেবের অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণের আরো দৃষ্টান্ত আছে। মনে পড়ছে, ১৯৭৪-এ শান্তিদার অবসর গ্রহণ এবং আর্থিক অসচ্ছলতার খবর কোনো এক শান্তিদেব-অনুরাগী মারফৎ তাঁর একদা-ছাত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কানে যায়। কিছু কালের মধ্যেই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী-আচার্য ইন্দিরা গবেষণা-বৃত্তি স্বরূপ

দশ হাজার টাকার এক চেক পাঠান তাঁর শান্তিনিকেতন-জীবনের প্রাক্তন সংগীত-নৃত্য শিক্ষক শান্তিদেবের নামে। প্রেরয়িত্রীর সম্মানার্থ প্রথম বার এবং সেই একবারই তা গ্রহণ করে শান্তিদা ইন্দিরাকে জানান— "আমার বদলে দেশের অগণিত দুঃস্থ লোকশিল্পীকে এই আর্থিক অনুদান বিলি করে দিলে আমার ভালো লাগবে।"

এই লোকসংগীত শিল্পীদের প্রতি শান্তিদেবের অনুরাগ ইন্দিরার অজানা ছিল না। পঞ্চাশের দশকে প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে দিল্লিতে প্রধানত তাঁরই উদ্যোগে বছরের পর বছর লোকনৃত্যের সর্বভারতীয় সম্মিলন ও প্রতিযোগিতা আয়োজিত হত। তাতে বিচারকরূপে শান্তিদেবকে নিয়মিত আমন্ত্রণ জানাতেন ইন্দিরা। ফলে বিভিন্ন প্রদেশের লোকসংস্কৃতির সঙ্গে আরো গভীরভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগও পেয়েছিলেন তিনি—আর সেজন্য ধন্যবাদও জানিয়েছেন ইন্দিরাকে।

শুধু লোকসংগীত নয়, গ্রামীণ বা কুটির শিল্পের প্রতি তাঁর দুর্নিবার আকর্ষণ অবশ্যই উল্লেখ্য। বর্তমান কালের কাঁথা শিল্পের প্রসারের ক্ষেত্রে তাঁর যে পরোক্ষ ভূমিকা রয়েছে তা অনেকেরই অজানা। হাসিবৌদি কলাভবনের প্রাক্তন ছাত্রী। তাঁকে কাঁথা শিল্পের পুনরুদ্ধারে উৎসাহ জুগিয়েছেন শান্তিদা। নানুরে কিংবা কেনডাডালে যেখানেই ভালো অথচ প্রাচীন কাঁথার সন্ধান পেয়েছেন, হাসিবৌদিকে নিয়ে ছুটেছেন সেখানে। শুনেছেন আমাদের গ্রামের বাড়ি হাটসেরান্দিতে পটে আঁকা দুর্গার পুজো হয়, বেশ কয়েকবার গেছেন সেখানে। পটশিল্পীদের সঙ্গে আলাপ করেছেন দীর্ঘক্ষণ ধরে, জেনেছেন তাঁদের মূর্তি-আঁকার রীতিপদ্ধতি— কলাকৌশল। সর্বত্রই সর্বগ্রাসী কৌতূহলী মনের পরিচয় পেয়েছি তাঁর। গুরুদেব তো ছাত্রদের কাছ থেকে এই 'অপ্রতিহত ঔৎসুক্য'-ই চেয়েছিলেন— বলেছিলেন তাঁর ছাত্ররা হবে 'চক্ষুষ্মান', 'সন্ধানী' এবং 'বিশ্বকুতূহলী'। শান্তিদেবের মধ্যে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় মিলেছে। রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শ যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁর জীবনচর্যায়। শিল্প-সংগীত থেকে শুরু করে দেশের রাজনীতি কিংবা বিশ্বভারতীর সমস্যা প্রতিটি বিষয়েই লক্ষ করেছি শান্তিদার অসীম আগ্রহ। অশীতিপর বয়সেও কোনো ক্লান্তি ছিল না দেশকে দেখার বা জানার। জীবনের শেষদশকে বেশি দূরে কোথাও যেতে না পারলেও বীরভূমের প্রতিটি লোকসংস্কৃতির অনুষ্ঠানে তাঁর উপস্থিতি হয়ে উঠেছিল অনিবার্য। বয়স বেড়েছে কিন্তু মন রয়ে গেছে পূর্ণ মাত্রায় সজীব। এই শিক্ষা হয়েছে তাঁর গুরুদেবের জীবন থেকেই। সেইসঙ্গে আরো দেখেছি মিথ্যাচার, ভণ্ডামি, দুর্নীতির প্রতি শান্তিদার প্রবল ঘৃণা, আর সেই ঘৃণা অকপটে প্রকাশ করার শক্তি— যা কি না এ কালে একান্তই দুর্লভ। দ্বি-চারিতা তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ। ফলে বরাবরই তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গ— একক। দলগড়ার মানসিকতা বা সামর্থ্য তাঁর ছিল না। শান্তিনিকেতন সমাজ এখন সভা, সংঘ, অ্যাসোসিয়েশন ইত্যাদি নানা দলে বিভক্ত। কিন্তু, শান্তিদা কখনোই দলভুক্ত হতে পারেন নি। যথার্থ শিল্পীর জীবন যাপন করেছেন তিনি।

সারাজীবন কাটিয়ে গেলেন পিতা কালীমোহন ও জননী মনোরমার স্মৃতিবিজড়িত মাটির দেওয়াল আর টিনের চালের বাড়িতে। এ ব্যাপারেও তিনি তাঁর পূজনীয় গুরুদেবেরই যোগ্য শিষ্য। মনে পড়ে যায়, প্রিন্স দ্বারকানাথের প্রপৌত্র রথীন্দ্রনাথের প্রাসাদোপম 'উদয়ন' ছেড়ে মাটির কুটির 'শ্যামলী'-তে রবীন্দ্রনাথের বাস করার ঘটনা। সংগতি থাকলেও আধুনিক কালের শৈলী অনুযায়ী বাড়ি বানানোর বিন্দুমাত্র বাসনা শান্তিদার মুখে কখনো শুনি নি, বরঞ্চ লজ্জা পেয়েছি আমি নিজে যখন তাঁর শ্রীপল্লীর বাসস্থানের অনতিদূরে হাল-ফ্যাশনের নতুন বাড়িতে বাস আরম্ভ করেছি। শান্তিদার সরল, অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা এ-যুগের শান্তিনিকেতনবাসীর কাছে প্রতীকী হয়ে রইল।

শান্তিদেবের জীবন সায়াহ্নের কিছু ঘটনা— যার প্রত্যক্ষদর্শী আমি— উল্লেখ্য মনে করি। মৃত্যুর একবছর আগে ১৯৯৮-এর ডিসেম্বরে স্পন্‌ডেলাইটিসে আক্রান্ত হলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলকাতায় এস. এস. কে. এম. হাসপাতালে শান্তিদার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন এবং সেই চিকিৎসার ফলে আরোগ্যলাভ করে তিনি আবার ফিরে আসেন শান্তিনিকেতনে। তখন থেকেই দেখেছি সাংসদ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, সমকালীন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, পরিবহণ মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী, বামপন্থী নেতা বিমান বসু, অস্থায়ী রাজ্যপাল শ্যামল সেন প্রমুখ নিয়মিত তাঁর স্বাস্থ্যের খোঁজ-খবর নিয়েছেন, কোনো সমস্যা হলেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। কেউ কেউ শান্তিনিকেতনে এলেই শান্তিদার বাড়িতে দেখা করে গেছেন। যোগাযোগ রেখেছেন ভ্রাতুষ্পুত্র আলোকময়-মারফৎ। সিউড়ি থেকে প্রায়ই এসেছেন ব্রজমোহন মুখোপাধ্যায়, অরুণ চৌধুরী জানতে চেয়েছেন কোনো কিছুর অসুবিধা আছে কি না —বোলপুর মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকরাও প্রয়োজন পড়লেই হাজির হয়েছেন। তাতে অভিভূত হয়েছেন শান্তিদা— আমাকে বার বার বলেছেন, শেষ জীবনে এঁদের কাছে যা পেলাম তাতে আমি ধন্য। আর লোকান্তরিত হওয়ার পর রাজ্য সরকার সারা দেশের প্রতিনিধিরূপে যেভাবে শান্তিদেবকে শেষ বিদায় জানিয়েছেন তাতে আমরা কৃতজ্ঞ।

শান্তিদেবের তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকীতে ভারত সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রক-মুদ্রিত শান্তিদেব-নামাঙ্কিত ডাকটিকিট প্রকাশকে উপলক্ষ করেই বিশ্বভারতীর এই স্মারক-পত্রিকার পরিকল্পনা। বিলম্বিত হলেও এই উদ্যোগের জন্য সাধুবাদ জানাই উপাচার্য সুজিতকুমার বসুকে। ডাকটিকিট প্রকাশের জন্য ধন্যবাদার্হ যোগাযোগ মন্ত্রী প্রমোদ মহাজন এবং সর্বোপরি সাংসদ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়— যাঁর মতো শান্তিদেব-অনুরাগী কোনো রাজনীতিজ্ঞ এ যাবৎ আমি দেখি নি। তাঁরই পরামর্শে গত এপ্রিলের গোড়ায় এই ডাকটিকিট প্রকাশের জন্য কতিপয় আশ্রমিক যোগাযোগ মন্ত্রকের কাছে আবেদন জানান। সেই সূত্র ধরেই শেষাবধি সোমনাথবাবুর একক ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সম্ভব হয়েছে এই স্মারক ডাকটিকিট-প্রকাশ।

কোমলে-কঠোরে শান্তিদা

সিতাংশু রায়

শান্তিদার ব্যক্তিত্ব ছিল বজ্রের চেয়ে কঠোর, আবার কুসুমের চেয়ে কোমল। যারা তাঁর তিরস্কারে তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে এসেছে, তারা তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় পায় নি, তাঁকে ভুল বুঝেছে। তাঁর কোমল হৃদয়বৃত্তির পরিচয় পেতে গেলে একটু ধৈর্য চাই, একটু সহিষ্ণুতা চাই।

প্রশাসক হিসাবে অর্থাৎ বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রসংগীত ও নৃত্য বিভাগের প্রধান অধ্যাপক এবং সংগীতভবনের অধ্যক্ষ হিসাবে শান্তিদা ছিলেন নির্ভীক। ছাত্র-ছাত্রী, সহকর্মী ও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ উপাচার্য সকলেরই একান্ত মান্য ছিলেন শান্তিদা। তাঁর নির্দেশে, তাঁর দাপটে সকলকেই যথাযথভাবে আপন আপন দায়িত্ব পালন করতেই হত।

কিন্তু আবার চায়ের বিরতিতে, অবসর সময়ের আড্ডায়, পিকনিকে, এক্সকার্শনে শান্তিদা ছিলেন খুব খোলা মনের। হাসি-তামাশায় জমিয়ে রাখতেন সকলকে।

একটা বয়স পর্যন্ত শান্তিদার কণ্ঠস্বর ছিল অসাধারণ সুরেলা। তানপুরা বা এস্রাজ বাজিয়ে তিনি গান গাইতেন। নিজে হাতে এস্রাজ বাজিয়ে তিনি ক্লাসে ও উৎসবের মহড়ায় গান শেখাতেন। বয়সের কারণে তাঁর কণ্ঠ যখন কম্পিত তখনই তিনি হারমোনিয়াম-বাদকের সাহায্য নিয়েছেন। তবু তাঁর কণ্ঠ কোনোদিন ক্লান্ত হয় নি। তাঁর কণ্ঠও যেমন চলত, লেখনীও তেমনি চলত।

শান্তিদার স্বরক্ষেপণের ভঙ্গির মধ্যে ছিল রবীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথ উভয়েরই প্রভাব। তবু তাঁর মুক্তকণ্ঠের স্টাইল তাঁর নিজেরই। তাঁর গানে একঘেয়েমি ছিল না ; কারণ, গান অনুসারে তিনি কণ্ঠ নিয়ন্ত্রণ করতেন। 'কৃষ্ণ কলি' তিনি এক ভঙ্গিতে গাইতেন, 'বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি, আর এক ভঙ্গিতে, আবার 'চলে যায় মরি হায়' আর-এক ভঙ্গিতে। তাঁর সাবলীল ভঙ্গির 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি' স্বরলিপির বন্ধনের মধ্যে নেই, পাওয়া যাবে না। আবার, ফাল্গুনী নাটকের অন্ধমুনির 'ধীরে বন্ধু ধীরে' গানটি শান্তিদা যে কী সুন্দর সুরে ও শৈলীতে গেয়েছেন, তা এক কথায় অসাধারণ, অপূর্ব।

বিশ্বভারতী থেকে অবসর গ্রহণের পরেও শান্তিদার অবসর ছিল না। বাড়িতে বসে গানের পর গান গেয়ে যেতেন তিনি। তাঁর অনুরাগীরা তাঁকে হারমোনিয়ামে এস্রাজে তবলায় খোলে মন্দিরায় সংগত করত। তাদেরও অনুশীলন হয়ে যেত গুরু-সান্নিধ্যে। সামাজিকতার বন্ধনে শান্তিদা আশ্রমজীবনে সকলের সঙ্গে আবদ্ধ ছিলেন। কারো প্রতি কোনো কারণে রুষ্ট হলে তাকে শান্তিদা যেমন বেশ দু-কথা শুনিয়ে দিতেন, তেমনি আবার বিবাহ উপনয়ন গৃহপ্রবেশ প্রভৃতি পারিবারিক অনুষ্ঠানে কেউ তাঁকে নিমন্ত্রণ করলে তিনি সস্নেহে সেগুলিতে যোগ দিতে যেতেন।

৭ই পৌষের উপাসনায়, বসন্তোৎসবের সকালের অনুষ্ঠানে ও আরো অন্যান্য অনুষ্ঠানে শান্তিদার একটি করে গান অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ ছিল তাঁর জীবনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত।

রবীন্দ্রনাথই নাম পাল্টে রাখেন শান্তিদেব

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

এ সৌভাগ্য একান্তই রবীন্দ্রনাথের অতিশয় অন্তরঙ্গ মাত্র দু-একজন প্রিয়জনের ক্ষেত্রেই শুধু ঘটেছে। খুব কাছের মানুষ ছাড়া এ ঘটনা দুর্লভ। স্ত্রীর নাম ছিল ভবতারিণী। নিজের মতো করে সাজিয়ে নিতে চাইলেন তাঁকে— নতুন নাম দিলেন মৃণালিনী। রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট মন্তব্য, 'নামকে যাঁহারা নামমাত্র মনে করেন আমি তাঁহাদের দলে নই।' মানুষের মাধুর্য গোলাপের মতো সর্বাংশে সুগোচর নয়, অনেকগুলি সূক্ষ্ম সুকুমার সমাবেশে সে অনির্বচনীয়তার উদ্রেক করে। 'তাহাকে আমরা কেবল ইন্দ্রিয় দ্বারা পাই না, কল্পনা দ্বারা সৃষ্টি করি। নাম সেই সৃষ্টিকার্যের সহায়তা করে।' কালীমোহন ঘোষ তাঁর ছেলেদের নাম রেখেছিলেন শান্তিময়, সাগরময়, সমীরময়, সলিলময়, সুবীরময়, শুভময়। শুভময়ের দিদি সুজাতা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর একান্ত স্নেহের পাত্র, তাঁর গানের যথার্থ সমজদার, তাঁর সুরের প্রকৃত বার্তাবাহী, তাঁর সৃষ্টিকর্মের প্রতিভাশালী তরুণ সহায়ক শান্তিময়ের নতুন নামকরণ করলেন শান্তিদেব। সেই থেকেই তিনি শান্তিদেব— শান্তিদেব ঘোষ। উননব্বই বছর বয়সে প্রয়াত হন শতাব্দী-শেষের পূর্বমুহূর্তে। সেই শৈশব থেকে আজীবন সুরের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের বাণী প্রচার করে এসেছেন পিপাসিত বাঙালির চিত্তভূমিতে। আমার মতে শান্তিদেব ঘোষ শুধু একজন সংগীতশিল্পী বা গায়কমাত্রই ছিলেন না— তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের গানের মর্মব্যাখ্যাতা— রবীন্দ্রসংগীতের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার। সে-কাজ সমালোচকের কলম দিয়ে নয়— তা তিনি করেছেন তাঁর অবিস্মরণীয় গায়কীর মধ্য দিয়ে।

শান্তিদেব ঘোষ রবীন্দ্রসংগীতের গায়ক হিসেবে কখনই খুব জনপ্রিয় ছিলেন না। তাঁর রেকর্ডের সংখ্যা খুবই সামান্য। দেবব্রত সুচিত্রা হেমন্ত কণিকার রেকর্ডের পরিমাণের সঙ্গে তার কোনো তুলনাই চলে না। রবীন্দ্রসংগীতের সাধারণ বাঙালি শ্রোতা যে তাঁর গানে আকর্ষণ অনুভব করত না বা পছন্দ করত না— সে-কথাটা মেনে নেওয়াই ভালো। কিন্তু একশোবার মনে রাখতে হবে জনপ্রিয়তাই শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি নয়। আমার প্রশ্ন হ'ল যাঁরা শান্তিদেব ঘোষকে আমাদের কালের —একই

সর্বজনশ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীরূপে উল্লেখ করেন তা কী জন্য? তিনি কি নব্বই ছোঁয়া প্রবীণ গায়ক বলে সর্বজনশ্রদ্ধেয়? তিনি রবীন্দ্রসান্নিধ্যধন্য মানুষ বলে সর্বজনশ্রদ্ধেয়? তিনি কি বিশ্বভারতীর সংগীতভবনের দীর্ঘকালের পরিচালক ছিলেন বলে সর্বজনশ্রদ্ধেয়? তিনি কি বিশ্বভারতীর মিউজিক বোর্ডের সদস্য ছিলেন বলে সর্বজনশ্রদ্ধেয়? তিনি কি কয়েকটি বিশিষ্ট গ্রন্থের রচয়িতা বলে সর্বজনশ্রদ্ধেয়? তিনি কি দেশিকোত্তম বলে সর্বজনশ্রদ্ধেয়? তিনি কি সরকারি সম্মাননায় সংবর্ধিত বলে সর্বজনশ্রদ্ধেয়? তাঁর মুখাগ্নির সময় পুলিসকর্মীদের বিউগিল বেজেছিল বলে কি তিনি সর্বজনশ্রদ্ধেয়? এই-এই কারণে যদি আমরা বলি তিনি আমাদের সর্বজনশ্রদ্ধেয়, তবে তাঁকে শ্রদ্ধার চেয়ে অশ্রদ্ধাই করা হবে বেশি। মানুষের কাছ থেকে শিল্পী চান তাঁর শিল্পের মর্যাদা, পদমর্যাদা নয়। শান্তিদার প্রথম ও প্রধান পরিচয় তিনি রবীন্দ্রসংগীতের গায়ক। সেই পরিচয়েই তাঁর বাকি সব পরিচয়। আর সেই পরিচয়েই যদি আমরা তাঁকে চিনতে না পারি, তাহলে অন্যান্য পরিচয়ের মূল্য কী, সার্থকতা কোথায়? সাধারণ লোক তাঁর গানে আকৃষ্ট বা আপ্লুত না হতে পারে; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানের অন্তস্থলে যাঁরা প্রবেশ করতে চান, রবীন্দ্রনাথের গানের অর্থের গভীরে যাঁরা অবগাহন করতে চান, রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যে দিয়ে যাঁরা সরাসরি রবীন্দ্রনাথকেই পাবার আকাঙ্ক্ষা করেন— তাঁদের কাছে শান্তিদেব ঘোষ অপরিহার্য, তাঁদের কাছে শান্তিদেব ঘোষ এক মহান শিল্পী। শান্তিদেব ঘোষের গানের সঙ্গে একমাত্র তুলনা চলে দিনু ঠাকুর— দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর সাহানা দেবীর। শান্তিদার গান তো শুধু কানে শোনার জন্য নয়— তা চোখ বুজে দেখবার— হৃদয় দিয়ে অনুভব করবার। আমার অনেক সময়েই মনে হয়েছে শান্তিদার গাওয়া গানে সেই রবীন্দ্রসংগীতের অর্থের বিস্তার ঘটেছে।

যে গান অন্যের মুখে বারে বারে শুনেছি সেই গান শান্তিদার গলায় নতুন করে এমন চমক সৃষ্টি করে কেন? সমস্ত গানটা তার প্রচলিত পুরনো অর্থের খোলস ছেড়ে নতুন করে অর্থবহ হয়ে ওঠে, রবীন্দ্রনাথকে নতুন করে খুঁজে পাই, গানটি আমার কাছে আরো মূল্যবান, আরো তাৎপর্যপূর্ণ এবং আরো অন্তরঙ্গ প্রিয় হয়ে ওঠে। গান শুনে আসার পর বাড়িতে ফিরে গীতবিতান খুলে তিনবার সে-গান পড়তে হয়। যা ছিল একান্ত সাধারণ, শান্তিদার স্পর্শে তা মুহূর্তে হয়ে ওঠে অসাধারণ। মনে মনে ভাবতে হয় এমন রত্ন এই গীতবিতানেই ছিল!

শৈশবে বাড়িতে আমাদের হিজ মাস্টারস্ ভয়েজের রেডিয়ো সেটে তাঁর কৃষ্ণকলি গানের রেকর্ড প্রথম শুনি। তার আগে কোনো কোনো ২৫শে বৈশাখে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠের গান শুনেছিলাম। শান্তিদেব ঘোষের গলায় যখন 'কৃষ্ণকলি' গানটি প্রথম শুনি, মুহূর্তে মনে হয়েছিল— এ যেন হুবহু হিজ মাস্টারস্ ভয়েজ

—একই রকম কণ্ঠস্বর উচ্চারণভঙ্গি স্বরক্ষেপণ— গান শেষ হবার পর জানতে পারি এ গান গুরুদেবের গাওয়া নয়, এ তাঁর শিষ্যের কণ্ঠস্বর। তাঁর নাম শান্তিদেব ঘোষ।

বিশ পঞ্চাশখানার দরকার নেই, ওই একটা গানই আমাদের কাল ও নতুন কালের প্রজন্মকে বুঝিয়ে দিতে পারে কেন শান্তিদেব বাকি বিশ পঁচিশ পঞ্চাশজনের থেকে স্বতন্ত্র এবং অননুকরণীয়।

'কালো তারে বলে গাঁয়ের লোক/কালো? তা সে যতই কালো হোক, দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ।' বাংলার ঘরে ঘরে কত কালো বালিকা-কন্যা তাদের জীবনসমুদ্র এই গানের তরণীতে চেপে পার হয়ে গেল! রবীন্দ্রনাথ যবেই লিখুন আমরা শান্তিদার গানেই প্রথম দেখতে শিখেছি 'কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখ।' গান তো শুধু শ্রুতিসুখকরমাত্র নয়, তার আবেদন হৃদয়ে এবং মস্তিষ্কেও অনেকখানি।

শান্তিদার এই গানটি (রবীন্দ্রসংগীত হলেও লোকে আজও একে শান্তিদেব ঘোষের গানই বলে) পরে অনেকেই নতুন করে গাইতে চেয়েছেন— রেডিয়ো দূরদর্শনে রেকর্ডে বা অনুষ্ঠানে। সকলেই একটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে গাইতে চেয়েছেন। 'কালো?' সেই গভীর বেদনাময় খুশিতে ভরা বিস্ময়কর জিজ্ঞাসা! কতজনের গলায় কতভাবেই তো জিজ্ঞাসিত হল 'কালো?' 'কালো?' 'কালো?' কিন্তু কোথায় সেই বিশ্বাসযোগ্য অর্থবহ ব্যাকুলতা? কার গানে এমন করে 'পুবে বাতাস এল হঠাৎ ধেয়ে,' কার গানে এমন করে 'ধানের খেতে খেলিয়ে গেল ঢেউ,' কার গানে দিগন্তবিস্তৃত সমস্ত মাঠ জুড়ে এমন অভূতপূর্ব নির্জনতা, মেঘলা দিনে কেই-বা এমন করে দেখতে পেয়েছে 'কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখ'? শান্তিদা যেভাবে পেরেছিলেন সেভাবে কেউই কিন্তু আর পারেন নি। একথা শান্তিদার ছাত্রী সুচিত্রা মিত্রও নিশ্চয় অস্বীকার করবেন না।

শান্তিদার স্বকণ্ঠে ও-গান পরে আমি আরো দু-একবার শুনেছি। প্রতিবারেই মনে হয়েছে গান শুনছি না ছবি দেখছি? ছবির পর ছবি এঁকে যাচ্ছেন গানের মধ্য দিয়ে। যখন তিনি গাইতেন— 'ধানের খেতে খে-লি-য়ে গেল ঢেউ'— তখন সত্যিই মনে হত পুবের বাতাস যেন আমাদেরও গায়ে এসে স্পর্শ করছে, ধানের খেত থেকে ভেসে আসা গন্ধও যেন তাকে জড়িয়ে আছে।

এ বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই যে রবীন্দ্রসংগীত অক্ষুণ্ন রাখার জন্য শুধু সুরশিক্ষা করলেই চলবে না ; গীতবিতান পড়ে তাঁর গান বোঝবার জন্য শিক্ষিত হতে হবে। 'একা তো গায়কের নহে তো গান গাহিতে হবে দুইজনে'— এর অর্থ একালের অনেক গায়ক-গায়িকা বোঝে বলে মনে হয় না।

গান যে কতখানি সাধনার বিষয় তা তাঁর বৃদ্ধ বয়সেও শান্তিদাকে দেখে

জেনেছিলাম। শেষ বয়সেও প্রতিদিন সকালে তিনি দু-তিন ঘণ্টা রেওয়াজ করতেন। শান্তিনিকেতনে সংগীতভবনের পাশেই ছিল তাঁর কুটির। প্রকৃত অর্থেই কুটির। মাটি ও টিনের চালের ঘর। সকালে সেই কুটিরের পাশ দিয়ে গেলে গানের সুরে-সুরে মন হারিয়ে যেত।

'ওই আসনতলে মাটির 'পরে লুটিয়ে রব,/তোমার চরণ-ধূলায় ধূলায় ধূসর হব।' গুরুদেবের স্মরণে বা রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে যখনই কোথাও তাঁকে গাইতে হয়েছে, এই গানটি তাঁর নিবেদনে অবশ্যই থেকেছে। এই গানটিই ছিল তাঁর জীবনের ধ্রুবপদ।

পিতার মধ্যে যে রবীন্দ্রভক্তি দেখেছিলেন তা পুত্রে সঞ্চারিত হয়েছিল। শান্তিদা ও তাঁর সকল ভাই-বোনের মধ্যে।

মানুষ হিসেবেও শান্তিদা ছিলেন প্রকৃত রবীন্দ্র-আদর্শে গড়া। হাসিবৌদি-শান্তিদার ওই কুটির ছিল সত্যিকারের সেকালের শান্তিনিকেতনের গুরুগৃহ। একাধিকবার আমি শান্তিদার ইন্টারভিউ নিয়েছি। কিছু প্রকাশিত হয়েছে, কিছু এখনো অপ্রকাশিত। সাগরময় ঘোষের একটা দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম বছর দশেক আগে শান্তিদার ওই কুটিরে বসেই। বিশাল ইন্টারভিউটা সাগরদার মৃত্যুর পর 'কলেজ স্ট্রীট' পত্রিকার বিশেষ স্মরণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

সাগরদাকে প্রশ্ন করেছিলাম : আপনার এত বড়ো প্রতিষ্ঠা আর অসামান্য জীবনসাফল্যের মূলে আপনার পারিবারিক জীবনে কার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি? উত্তরে সাগরময় বলেন : পারিবারিক জীবনে স্ত্রীর ভূমিকা তো নিশ্চয়ই, সে তো বটেই, এবং আমার দাদা। দাদা এখনো আমার কাছে একটি জীবন্ত আদর্শ হয়ে আছে। তাঁর স্ট্রাগল আমি তো ছোটোবেলা থেকে দেখেছি। বাবা যখন মারা গেলেন তখন —এত বড়ো সংসারে এতগুলি ভাইবোন— সমস্ত চাপটা ওঁর ওপর এসে পড়েছিল। এবং আজও পর্যন্ত সেটাকে তিনি কিভাবে টেনে নিয়ে চলেছেন। চোখের সামনে একটি জ্বলন্ত আদর্শ হয়ে আজও রয়েছেন।

কালীমোহন ঘোষের প্রথম দুই পুত্র— শান্তিদেব ও সাগরময়। একজন রবীন্দ্রসংগীতের জগতে বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ শিল্পী ; আর-একজন সাহিত্যক্ষেত্রে বিশ শতকের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ সম্পাদক। শিল্পীর সম্পর্কে সম্পাদকের এই পারিবারিক উক্তি শান্তিদা মানুষটিকে চিনে নেবার পক্ষে খুবই মূল্যবান।

সহজ সরল সোজা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন শান্তিদা। নিঃসন্তান। ভাইবোনদের এবং সেইসঙ্গে শান্তিনিকেতনের মানুষদের তিনি দু-হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। অগাধ স্নেহ পেয়েছিলাম তাঁর কাছ থেকে। একবার তাঁর বাল্যকালের একটি ইতিবৃত্ত আমাকে লিখতে হয়। কয়েক দিনের চেষ্টায় তাঁর কাছ থেকে সেই-সব পুরনো কাহিনী উদ্ধার করি। এ রচনায় তিনি কথক, আমি অনুলেখক। কাগজে

লেখাটি প্রকাশের ক'দিন পরেই আমার ঠিকানায় শান্তিদার একখানি পত্র এল—
শান্তিনিকেতন,
২৯/৬/৮৫
প্রীতিভাজনেষু, অমিত্রসূদন,
গত রবিবার আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত আমার বাল্যজীবনের স্মৃতিকথায় তুমি যেভাবে পরিশ্রম করে লিখেছ তার জন্য তোমাকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। তবে পত্রিকায় লেখক হিসাবে তোমার নাম প্রকাশিত না হওয়ায় আমি খুবই দুঃখিত।

আনন্দবাজার পত্রিকার বিভাগীয় সম্পাদক মহাশয়ের সঙ্গে, তোমার নাম না প্রকাশের জন্য কথা বলেছিলাম। তিনি বললেন, তোমার সঙ্গে তিনি সাক্ষাতে এ নিয়ে কথা কইবেন এবং এর কারণ সম্পর্কে তোমাকে বলবেন। শুভেচ্ছা ও প্রীতি নিও।
ইতি
তোমাদের
শান্তিদা।
আমার নাম যে বেরয়নি তা শান্তিদার চিঠির পর খেয়াল হল। সম্পাদক মশাইকে আজ আমিও মনে মনে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই— ভাগ্যিস আমার নামটি ওই রচনায় প্রকাশিত হয় নি ; তাই শান্তিদার কাছ থেকে এমন একটি দুর্লভ চিঠি আমি উপহার পেয়েছিলাম।

পুজোর ছুটির গোড়ায় শান্তিনিকেতন ডাকঘরের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প হল। তিনি সকলের সঙ্গেই প্রসন্নচিত্তে কথা বলতে ভালোবাসতেন। তিনি রিক্‌শায় বসে, আমি চিঠি ফেলব বলে ডাকঘরের সামনে দাঁড়িয়ে। সাগরদার সেই ইন্টারভিউটা প্রকাশিত হয়েছে জেনে খুশি হলেন— দেখতে চাইলেন। আরো এটা-সেটা কথা হল। গেরুয়া বসন, মাথায় গেরুয়া টুপি। সকালের ঝলমলে আলোয় খুব প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল তাঁকে।

সেই শেষ দেখা। পুজোর ছুটিতে বাইরে গিয়েছিলাম। যেদিন ফিরলাম, শুনলাম শান্তিদা অসুস্থ— কলকাতায়। তারপরেই সব শেষ।

শবযাত্রীরা উত্তরায়ণ-ছাতিমতলা-মন্দির পার হয়ে বাঁ দিকে বাঁক নিল। ডাকঘরের সামনে দিয়ে 'আগুনের পরশমণি' ছোঁয়াও প্রাণে গাইতে গাইতে তারা শ্মশানের দিকে এগিয়ে চলল। ঠিক আগের মাসে যেখানে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে শেষ কথা বলেছিলাম, ঠিক সেইখান থেকে দু-হাত তুলে প্রণাম জানিয়ে তাঁকে চিরবিদায় দিলাম। মুম্বাইতে শরৎচন্দ্রের জন্মশতবর্ষে নিখিল-ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধনে শান্তিদা গেয়েছিলেন— 'মরণ সাগর পারে তোমরা অমর'— তাঁর সেই গানের সুরটাই সারাদিন আমাকে ঘিরে বাজতে লাগল।

গুরু-শিষ্য

গোরা সর্বাধিকারী

শান্তিনিকেতনে ছাত্র হয়ে ভর্তি হয়েছিলাম ১৯৬১ সালের ১২ জুলাই। ঐ দিনই আবার বোম্বাই-এর জাহাজঘাটা থেকে পি অ্যাণ্ড ও কোম্পানির "রোমা" নামের একটি জাহাজও ছেড়েছিল, যাতে আমার নামে একটা টিকিট কাটা ছিল। গন্তব্য হামবুর্গ। সেখানে নেমে ট্রেনে করে টুট্‌লিংগেন্ বলে একটা সুন্দর পাহাড়ে ঘেরা ছোট্ট শহরে যাব ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ডিপ্লোমা কোর্স করতে। বলা বাহুল্য, সেদিন ঐ জাহাজের কেবিনে আমার জায়গাটা খালি গিয়েছিল, কারণ সব কিছু বানচাল করে, বাড়িতে অনেক উৎপাত করে, গুরুজনদের সব ইচ্ছা উপেক্ষা করে গান শিখতে চলে এলাম এই শান্তিনিকেতনে।

এখানে এসে তখনো এমন অনেক শিক্ষক, শিক্ষিকা কর্মীদের পেয়েছিলাম যাঁদের স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আশ্রমে নিয়ে এসেছিলেন। তখনো তাঁরা জমি চাষ করে যাচ্ছেন। নিজেদের অনেক স্বার্থত্যাগ করে। সেই বছরই ছিল গুরুদেবের জন্মশতবর্ষ। চলবে এক বছর ধরে। ঘরে ঘরে ঢুকতে শুরু করেছেন রবীন্দ্রনাথ। ভারতের প্রায় সমস্ত বড়ো বড়ো শহরে পালিত হতে লাগল জন্মশতবার্ষিকী উৎসব, সঙ্গে অবশ্যই রবীন্দ্রসংগীত।

আমি ছাত্র হয়ে যখন এখানে এলাম, তখন শতবর্ষের জোয়ার চলছে। বলতে গেলে সবে শুরু হয়েছে। সেই মুহূর্তে অনেকেই আছেন সংগীতভবনে গুরুদেবের স্নেহধন্য, কেবল শান্তিদেব ঘোষ নেই। কিছু কালের জন্য শান্তিনিকেতনে উনি ছিলেন না, তবে কয়েক মাসের মধ্যে এসে গেলেন নতুন করে। সেই বছরই অগস্ট মাসে। তখন সংগীতভবনে ওঁর কাছে শেখার প্রথম বছরের ছাত্র আমরা তিনজন ছিলাম। শিক্ষকরা ছাত্রদের ক্লাস নিতেন শিক্ষিকারা ছাত্রীদের। ছাত্রীরা সংখ্যায় বেশি ছিল। তখন একটাই কোর্স ছিল, ডিপ্লোমা, চার বছরের। সংগীতভবনে চার বছর মিলিয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ত্রিশ/বত্রিশজন। প্রথম বছর থেকে একজন মাস্টারমশাইয়ের কাছেই চার বছর এক একটি ব্যাচ্ শিখে যেত। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় (মোহরদি)ও আমাদের ক্লাসের মেয়েদের প্রথম বছরের ক্লাস নিতেন। মোহরদির কাছে একটা

জেনারেল ক্লাস থাকত তাতে সিলেবাসের গান ছাড়া অন্য গান, যেমন বৈতালিক বা ওনার পছন্দ মতো গান উনি শেখাতেন, সংগীতভবনের সমস্ত ইয়ারের ছেলে-মেয়েদের একসঙ্গে। ছাত্র-ছাত্রীদের পছন্দ মতো গানও তাতে শেখানো হত। মোহরদি তানপুরাটাকে শুইয়ে রেখে নিজে একহাতে বাজাতেন। সামনে স্বরলিপি খোলা থাকত, আর বাঁ হাতের আংটিটা দিয়ে তানপুরার তলার কাঠে হাল্কা করে ঠুকে ঠুকে তাল রাখতেন। শান্তিদা ক্লাসে এসেই তানপুরা বেঁধে দিয়ে একজনকে বাজাতে বলতেন, আর নিজে এস্রাজ বাঁধতেন অনেকক্ষণ ধরে। তারপর গান শেখাতেন নিজে এস্রাজ বাজিয়ে। কখনো স্বরলিপি দেখতেন আবার কখনো স্বরলিপির তোয়াক্কা করতেন না। শান্তিদা তাল রাখতেন পায়ের পাতা ঠুকে। শান্তিদা কিন্তু খুব আপনভোলা লোক ছিলেন। আমাদের হয়তো বলেছেন— সঞ্চারী থেকে আর-একবার গানটা করো। আমরা গান শেষ করে ফেলেছি, উনি কিন্তু এস্রাজে গানটা বাজিয়েই যাচ্ছেন মুখ নীচু করে। থামাথামি নেই। আমরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে শুনেই যাচ্ছি। ওনার মুখভর্তি পানের পিক। ফেলার জন্য যে উঠে যাবেন তাও খেয়াল নেই। মুখ ভর্তি পিক হলে যেমন হয়ে যায় মুখটা সেই ভাবেই বাজিয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ যখন অসহ্য হয়ে উঠেছে তখন অস্ফুট একটা আওয়াজ করে উঠে জানলার দিকে গিয়ে পিক নিক্ষেপ। মনে আছে এ ঘটনা প্রায়ই হত। কোনো রিহার্সালে মোহরদি কিংবা কুট্টুদি কেউ বলতেন—"শান্তিদা পিকটা ফেলে আসুন, গিলে ফেলবেন।" ফেলে এসে বলতেন— "আর বোলো না ভাই, সেদিন তো একেবারে কাপড়ে চোপড়ে হয়ে গিয়েছিল, আমার আবার খেয়াল থাকে না বুঝলে"— এইরকম ছিলেন শান্তিদা। মেজাজ ভালো থাকলে শান্তিদা অন্যরকম, একেবারে বন্ধুর মতো। আবার যদি মেজাজ খারাপ থাকত তাহলে আর রক্ষে নেই। মুখে যা আসত বলতেন। সেজন্য মেজাজ ভালো থাকলেও সব সময়ই একটা ভয় ভয় ভাব আমাদের মনে সদাই জাগ্রত থাকত।

একদিন গান শেখাচ্ছেন— "একদিন যারা মেরেছিল তাঁরে গিয়ে"। স্বরলিপি দেখে বেশ গাইছিলেন, হঠাৎ গেলেন খেপে। বললেন— এটা স্বরলিপি হয়েছে? আমি যেমন করছি সেই রকম করো। বলে শেখালেন পুরো গানটা। আমি ভয়ে ভয়ে আমার গীতবিতানটা এগিয়ে দিয়ে বললাম, শান্তিদা এই জায়গার স্বরলিপিটা আপনি লিখে দেবেন সই করে? বললেন দাও। সেই হাতের লেখা স্বরলিপি আমার পুরনো গীতবিতানে এখনো লেখা আছে। শান্তিদার সই করা। আবার কোনো দিন হয়ত কোনো নতুন রংচঙে জামা পরে সংগীতভবনে এসেছি, শান্তিদা ডেকে বললেন —কী হে, আজ কি বান্ধবীদের সঙ্গে কোথাও বেড়াতে টেড়াতে যাচ্ছ নাকি? এত সেজেগুজে এসেছ? এই ছিলেন শান্তিদা। শান্তিদা বড়ো একটা ধূমপান করতেন না।

মাঝে মাঝে খেয়াল হলে অশেষদার (অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায়) কাছ থেকে একসঙ্গে দুটো সিগারেট নিয়ে দুহাতে দুটো ধরে ঠোঁটের দু কোণে লাগিয়ে টানতেন। ধোঁয়া গিলতেন না। ফু-করে উড়িয়ে দিতেন। একদিনের একটা মজার ঘটনা মনে পড়ে যাচ্ছে। শান্তিদা, অশেষদা আরো কয়েকজন মাস্টারমশাই সংগীতভবন স্টেজের ধারে পা ঝুলিয়ে বসে আড্ডা দিচ্ছেন টিফিনের সময়। আমরাও ছাত্র-ছাত্রীরা ওই সময় চত্বরে ঘোরাফেরা করছি। সেখানে কয়েকটি ছাগলও চরছে। এমন সময় মোহরদি ও কুট্টুদি দরজা দিয়ে ক্লাসে যাবেন বলে ঢুকেছেন। অশেষদার মাথায় সঙ্গে সঙ্গে একটা রসিকতা খেলে গেছে। শান্তিদার সঙ্গে পরামর্শ করে মোহরদিকে ডেকে বললেন, "মোহর, এদিকে এস তোমার সঙ্গে একটা জরুরি কথা আছে"। মোহরদি সরল মনে এলেন। অশেষদা খুব গম্ভীর হয়ে ছাগলগুলোকে দেখিয়ে মোহরদিকে বললেন— শান্তিবাবু বললেন তুমি এক্ষুনি গিয়ে ছাগলগুলোর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম কর। কারণ ওরাই তো টপ্পার গুরু। তোমার প্রণাম করা উচিত। শান্তিদা প্রস্তুত ছিলেন না। হো হো করে হেসে উঠলেন। আসলে অশেষদার মাথায় এসেছে রসিকতাটা। উনি এরকমই রসিক ছিলেন। মোহরদি ওঁদের ভালো করেই চেনেন। দুজনেই ওঁনার গুরু, বললেন— "বেশ, তাহলে এবার থেকে গুরু প্রণামটা ওখানেই সারব তো?" সকলের একসঙ্গে এই নিয়ে কী হাসাহাসি, আমরা ছাত্র-ছাত্রীরা ওখানে উপস্থিত আছি বলে কোনো ভেদাভেদ নেই। এই ছিল এখানের জীবনযাত্রা। আমরাও অবাক হয়ে প্রাণখুলে হাসলাম। অনেক ঘটনাই আছে ছাত্র জীবনের। তখন শান্তিনিকেতনের মাস্টারমশাই ও ছাত্রদের সম্পর্ক ছিল একেবারে ঘরোয়া।

শান্তিদার ছোটোভাই ভুলুদা (শুভময় ঘোষ) মারা গেলেন ১৯৬৩ সালে। যখন ওঁনার খুব খারাপ অবস্থা। আমরা ছাত্ররা পালা করে সারারাত জাগতাম শান্তিদার বাড়িতে। ১৯৬৫ সালে বিশ্বভারতীতে আমি চাকরিতে যোগদান করলাম। শান্তিদা, মোহরদি দুজনেই খুব ভালোবাসতেন। আবদার করে ধরে পড়েছিলাম যে আমি এখানেই থাকতে চাই। ওঁরা কিন্তু আমার সেই আবদার রেখেছিলেন। সেই থেকে মোহরদির বাড়িতেই আমার থাকার শুরু। আমার বাবা মাকে কিছুতেই বাড়িভাড়া করে থাকতে দিলেন না। বীরেনদা (বীরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) ও মোহরদি। বললেন, —"আপনাদের ছেলে যখন বাড়ি যাবে তখন আপনাদের কাছে, যখন এখানে থাকবে আমাদের কাছে, এটাও ওর বাড়ি"। পরে অবশ্য এখানে থাকাটাই বেশি হয়ে গেল।

মোহরদিরা নীচুবাংলার কোয়ার্টারে গেলেন। শান্তিদা নিয়মিত রোজ বিকেল বেলা চা খেতে ঐ বাড়িতে আসতেন। কাজের লোক জগদীশ বিকেল চারটে বাজলেই বাড়ির আমরা তিনজন এবং সঙ্গে শান্তিদার জন্য এক কাপ চায়ের জল নিজে চাপিয়ে

দিত। বসার ঘরে বসে চা খেতে খেতে তিনজনের কত গল্প, হাসিঠাট্টা হত আমার এখনো মনে আছে। আমিও মাঝে মাঝে গুরুজনদের দলে থেকে নানান পুরনো কথা ওঁদের মুখ থেকে শুনতাম। টানা দশ বছর এই রুটিনের হেরফের হয় নি। গুরু শিষ্যার সম্পর্ক যে কত নিবিড় ছিল আমার চোখে দেখা। মাঝে মধ্যে মান অভিমান যে হত না তা নয়। সে মিটেও যেত। শান্তিদা দুদিন বাড়িতে এলেন না, চায়ের জল কিন্তু রোজই নিত জগদীশ। সংগীতভবনেই মিটমাট হয়ে যাবার পর মোহরদি বলতেন— "শান্তিদা আজকে যেন চা নষ্ট না হয়"। শান্তিদাও হা হা করে হেসে বলতেন— "বেশ বেশ, ঠিক সময়েই যাব"। দুজনে আর-একটি নেশার পরস্পর সঙ্গী ছিলেন, সেটা পান জর্দার। এটা নিয়েও বোধ হয় পরস্পরের হৃদয়ের একটা টান ছিল।

সেই নিয়ে শান্তিদার আর মোহরদির অনেক ঘটনা আছে। সব লিখতে গেলে অনেক জায়গা লাগবে। তবে, দুজনেরই জীবনের শেষ দিকে একবার একসঙ্গেই কলকাতার পি. জি. হাসপাতালে পাশাপাশি ঘরে ছিলেন। সেখানকার একটি ঘটনা না বলে পারছি না। ডাক্তার দুজনকেই জর্দা খেতে বারণ করেছেন। মোহরদি লুকিয়ে লুকিয়ে মাঝে মাঝে খান। আমরা টের পাই না। হাসিদি কিন্তু শান্তিদাকে কড়া নজরে রেখেছেন। সমানে সামনে বসে থেকে নজর রাখেন। দু-একদিন বাদে নানান পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে। তার কয়েকটির মধ্যে একটি মেজাজ খারাপ, খিট্‌খিটে ভাব। মোহরদি কিন্তু অনেক আবদার করে ডাক্তারকে বলে কয়ে দিনে এক-দুবার খেয়ে যাচ্ছেন আর শান্তিদার কষ্টটাও মনে মনে অনুভব করে যাচ্ছেন। একদিন সকালে পরস্পরের বাড়ির লোক হাসপাতালে পৌঁছনোর আগেই মোহরদি নার্সকে ধ'রে নিয়ে পাশেই শান্তিদার ঘরে নিঃশব্দে গিয়ে হাজির। হাতে লুকিয়ে একটু জর্দা আর সুপুরি। কুশল বিনিময়ের পর লুকিয়ে শান্তিদার হাতে একটু জর্দা আর একটু সুপুরি গুঁজে দিয়েই পালিয়ে এসে নিজের খাটে শুয়ে পড়েছেন। শান্তিদা তো হাতে চাঁদ পেলেন। মেজাজও ফুরফুরে হয়ে গেল। কিন্তু এমনই ভাগ্য, সেদিনই শান্তিদা হঠাৎ একটু অসুস্থ হয়ে পড়লেন। যদিও খানিক পরেই ঠিক হয়ে গেলেন। কিন্তু ততক্ষণে জর্দা রহস্য জানাজানি হয়ে গেছে। সবাই ভাবলেন এই জন্যই বোধ হয় শরীর খারাপ হয়েছে। মোহরদিরও খুব দুশ্চিন্তা হল। তবে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া খানিকক্ষণের মধ্যেই চলে গেল, শান্তিদা আরামও পেলেন।

১৯৭৫ সালে নিচুবাংলার বাড়ি ছেড়ে মোহরদি এন্ড্রুজ পল্লীর বাড়িতে চলে এলেন। শান্তিদার সঙ্গে বাড়ির দূরত্ব বাড়ল বটে কিন্তু মনের দূরত্ব বাড়ে নি। তাই দুজনের চলে যাবার তারিখও বেশি দূরের নয়। দুজনের সম্পর্ক নিয়ে এত কথা লিখলাম তার কারণ, শান্তিদাকে ছাত্র অবস্থার পর মোহরদির কাছে থেকে এবং এত বছর শান্তিনিকেতনে থেকে যা দেখেছি তা হল দুটি শিল্পী মন। কত মধুর সম্পর্ক গুরু শিষ্যার, কত ভালোবাসা পরস্পরের মধ্যে। অনেক কথা এই আশ্রমের হাওয়ায় ভেসেছে, আলোচিত হয়েছে অন্যভাবে, এই দুই ব্যক্তিত্বকে নিয়ে। আমি তার মধ্যে যেতে চাই নি, আমি শুধু ভাবি— 'যা দেখেছি, যা পেয়েছি তুলনা তার নাই।'

শান্তিদা

সুপ্রিয় ঠাকুর

শান্তিনিকেতনের বাসিন্দা হওয়ার দরুন আমাদের মতো সাধারণ মানুষের কাছে একটা বিরাট সৌভাগ্য প্রায়শই আসে। আমরা অনায়াসে বিশেষ নামি দামি মানুষের সংস্পর্শে আসতে পারি। বাইরের মানুষেরা যে-সব ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যলাভের জন্য লালায়িত তাঁরা আমাদের সঙ্গে পরম-আত্মীয়ের মতো মেলামেশা করেন। অবশ্য এ কথাও ঠিক যে আমাদের আত্মীয়ের মতো গ্রহণ করায় সে-সব ব্যক্তিত্বের ঔদার্যই প্রকাশ পেয়ে থাকে।

শান্তিদা ছিলেন এই রকম একটি ব্যক্তিত্ব, যাঁর সান্নিধ্যে আমরা ধন্য হয়েছি। তিনি আমাদের এত কাছের মানুষ ছিলেন যে অনেক সময়ে এ কথা আমরা ভুলেই থাকতাম যে তাঁর দেশজোড়া খ্যাতি। অনেকেই তাঁর কাছ থেকে সামান্য কিছু শোনবার আশায় অথবা কিছুক্ষণ কাছাকাছি আসবার জন্য বহু ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন।

শিশুকাল থেকে দেখে এসেছি, আমার মা-এর কাছে শান্তিদা প্রায় রোজই আসতেন। হাসি ঠাট্টা গল্প করে, কফি খেয়ে কিছুটা সময় তিনি আমাদের বাড়িতে কাটিয়ে যেতেন। বিশেষ কোনো দিন, গল্প করতে করতে হয়তো তিনি গুরুদেবের কথা, তাঁর গান শেখার কথা অথবা অন্য অভিজ্ঞতার কথাও বলেছেন। নৈকট্যের অভ্যাসবশত হয়তো সে-সব কথায় মন দিই নি, তাঁর সে-সব মূল্যবান আলোচনা রক্ষা করার চেষ্টাও করি নি। ফলে আমার অবহেলায় কত কথা হারিয়ে গেছে তা আজ মনে করলে বিশেষ পাপবোধ হয়।

মনে পড়ে গল্পচ্ছলে একদিন শান্তিদা বলেছিলেন গুরুদেবের নৃত্যনাট্যগুলির জন্ম বৃত্তান্ত।

শান্তিনিকেতনের নানা উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে গুরুদেবের পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী, হয়তো বা কোনো কবিতাকে নাট্যরূপ দিয়ে মঞ্চস্থ করার জন্য তৈরি করে গুরুদেবের কাছে নিয়ে এসেছেন। সেই ইন্ধনে গুরুদেবের মনে সৃষ্টির আগুন জ্বলে উঠেছে। এবং তার ফলেই জন্ম নিয়েছে কালজয়ী কোনো নৃত্যনাট্য।

এই ধরনের কত-না অমূল্য ইতিহাস তাঁর কাছে শুনেছি। শুনে চমৎকৃত হয়েছি, আনন্দ পেয়েছি— কিন্তু ধরে রাখি নি।

ইন্দিরা দেবী শান্তিনিকেতনে আমাদের সঙ্গে তাঁর শেষ জীবন কাটিয়েছিলেন। তাঁর মূল্যবান সব কথা, অথবা শান্তিদা শৈলজদা ও আরো নানা গুণীজনের সঙ্গে তাঁর নানা বিষয় আলোচনা সব আমাদের শিশুকালকে ঘিরে হয়েছে। তখন সে-সব কথার মূল্যও বুঝি নি, ধরে রাখার প্রয়োজনও বোধ করি নি।

বিশ্বভারতীর নানা বিভাগের ছাত্র অবস্থায় নানাভাবে শান্তিদার কাছে পৌঁছবার সৌভাগ্য হয়েছে। সে-সব অভিজ্ঞতার চরিত্রটা ছিল বাড়িতে যাতায়াতের ধরনধারণের থেকে পৃথক। সে-সব ক্ষেত্রে তাঁকে পেয়েছিলাম শিক্ষক হিসাবে অথবা নাটকের পরিচালক হিসাবে। আমার বাড়িতে বা তাঁর বাড়িতে যে হালকা মেজাজ বা হাসি ঠাট্টার সম্পর্ক এ-সব ক্ষেত্রে উধাও হয়ে যেত। শিক্ষক শান্তিদা বা পরিচালক শান্তিদার গাম্ভীর্য একটা দূরত্ব সৃষ্টি করত। তখন তাঁকে রীতিমতো ভয় পেতাম।

আমাদের ছাত্রাবস্থায় বিদ্যাভবনের ছাত্র-ছাত্রীদের গান শেখার একটা ব্যবস্থা ছিল। আজকে ভাবতে অবাক লাগে আমাদের ক্লাস নিতেন শান্তিদা।

সংগীতভবনের একটি ঘরে শান্তিদা ক্লাস নিতেন। ঘাড়ে এস্রাজ ফেলে কত যে গান তিনি আমাদের শিখিয়েছেন তা আজ ভাবলে অবাক লাগে।

এই ক্লাসকে কেন্দ্র করে যেমন আনন্দ উপভোগ করেছি, আবার দু একটি অন্য ধরনের অভিজ্ঞতাও হয়েছে।

তখনকার দিনের রেওয়াজ অনুযায়ী সকালের বৈতালিকে একটি সপ্তাহ একটি ভবনের গান গাইবার দায়িত্ব থাকত এবং সেই সপ্তাহ শেষে বুধবারের মন্দিরে গানও সেই ভবনই গাইত। বৈতালিক ও মন্দিরের গানও বিদ্যাভবনের ছাত্র-ছাত্রীরা শান্তিদার কাছেই শিখত।

এমন একটি মন্দিরের কথা ভুলতে পারি না। বিদ্যাভবনের ছাত্র-ছাত্রীরা বুধবার সকালে গান গাইতে মন্দিরে গিয়েছি। দুর্ভাগ্যবশত ছাত্রীরা সকলেই উপস্থিত থাকলেও ছাত্রদের মধ্যে আমি একা।

শান্তিদা এস্রাজ কাঁধে পিছনে বসেছেন, সামনের লাইনে গায়ক-গায়িকারা। এতগুলি মেয়ের সঙ্গে পুরুষকণ্ঠ আমার একার ভেবে ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে গেছে।

প্রথম গানটি শুরু হল, আমার গলা দিয়ে স্বরই বের হতে চাইছে না, অথচ শান্তিদার ভয়ে না গাইবার সাহসও নেই। ঐ অবস্থায় গান ধরলাম। প্রথম লাইনটা শেষ হবার আগেই কোমরে ছড়ের খোঁচা ও চাপা কণ্ঠের নির্দেশ— চুপ করো।

মন্দিরে উপস্থিত সকলে দেখল যে একটি ছেলে গান গাইছিল, তাকে থামিয়ে দেওয়া হল।

লজ্জায় তখন আমি মাথা তুলতে পারছি না।

প্রথম গানের শেষে নির্দেশ এল— গাইতে যদি হয়, গলা খুলে গাও।

শান্তিদার পরিচালনায় 'ফাল্গুনী' করার অভিজ্ঞতা জীবনে ভুলব না।

প্রাক-কুটির— অধুনা পাঠভবনের শমীন্দ্র পাঠাগারের সামনে মঞ্চ বাঁধা হল। বকুল গাছ থেকে একটা দোলনা টাঙিয়ে দেওয়া হল। নাটক শুরু হল। সেই দোলনায় দুলতে দুলতে গান গাইছে একটি মেয়ে— ওগো দখিন হাওয়া, বোধ হয় সেদিনের ছোট্ট পিয়া, আজকের স্বনামধন্য গায়িকা ইন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায়। যৌবনের দলে আমরা নেচে গেয়ে মনে প্রাণে বসন্তকে অনুভব করেছিলাম— আর চন্দ্রহাসের ভূমিকায় ভুলুদা (শান্তিদার ছোটো ভাই) আমাদের দেখিয়ে দিয়েছিলেন ঐ চরিত্রটির আসল রূপ। আর যা জীবনে ভোলা যাবে না— তা হল অন্ধ বাউল স্বয়ং শান্তিদা। শান্তিদার অভিনয়, তাঁর নাচ, এবং সর্বোপরি তাঁর গান এ নাটকটিকে এক অন্য মাত্রা দান করত। এমন মার্জিত, সুসমঞ্জস অথচ দৃঢ় প্রকাশভঙ্গি অবাক হয়ে দেখতাম।

'সবাই যারে সব দিতেছে'— গানটির সঙ্গে অসাধারণ বাউল নাচ দেখে মনে হত যে এ মানুষটি তো মনে প্রাণে এক বাউল।

আর গানের কথা আলাদা করে কী বলার আছে। 'ধীরে বন্ধু'— গানটি তাঁর গলায় যা শুনেছি তেমনটি তো আর কোথাও শুনলাম না। উঁচু পর্দায় গাওয়াই তাঁর গাইবার রীতি ছিল,— 'চলব আমি নিশীথ রাতে, তোমার হাওয়ার ইশারাতে'— লাইনটি যখন গাইতেন, সে সুর আমাদের মনকে যে কোন্ ঊর্ধ্বে নিয়ে যেত সে-কথা স্মরণ করলে এখনো গায়ে কাঁটা দেয়।

কিন্তু পরিচালক শান্তিদাকে রীতিমতো ভয় পেতাম। মনোযোগের অথবা চেষ্টার ত্রুটি ঘটলে নিস্তার পাওয়ার উপায় ছিল না।

মনে হত শান্তিদার মতো মানুষ নানা সময়ে নানা স্তরে বিচরণ করে থাকেন। পরিচালক শান্তিদা যেখানে বিচরণ করতেন, গায়ক শান্তিদা সে-সব ত্যাগ করে কোন্ ঊর্ধ্বে উঠে যেতেন তার ঠিকানা পাওয়া যেত না।

আরো অনেক নাটক শান্তিদার পরিচালনায় করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।

'নটীর পূজা' নাটকের দল গিয়েছিল দক্ষিণ ভারতে। নানা শহরে সেবার 'নটীর পূজা' মঞ্চস্থ হয়। নাটকের শুরুতে দৃপ্ত কণ্ঠে শান্তিদা গাইতেন— 'পূর্ব গগন ভাগে দীপ্ত হইল সুপ্রভাত।' সুতরাং একেবারে আরম্ভে দর্শকেরা মোহিত হয়ে নাটকে প্রবেশ করত।

'অরূপরতনে' যখন শান্তিদা নাটকের জন্য আমায় ডেকেছিলেন তখন আমি নেহাত অর্বাচীন। সুবর্ণর ভূমিকায় অভিনয় করার সুযোগ পেয়ে সেদিন মনে হয়েছিল শান্তিদা আমাকে পুরস্কৃত করলেন।

এ ছাড়া 'মালিনী' নাটকের অভিনয় শান্তিদার কাছে শেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এ তালিকা বাড়িয়ে আর লাভ নেই।

'বাল্মীকি প্রতিভা'র কথা বলে এ প্রসঙ্গে ইতি টানি।

অনেকদিন বাইরে ঘোরাঘুরির পর ১৯৭৩ সালে শান্তিনিকেতনে ফিরলাম। যোগ দিলাম পাঠভবনের কাজে।

বোম্বাই থেকে শান্তিদা নাটকের দল নিয়ে যাওয়ার আমন্ত্রণ পেলেন। আমাদের সৌভাগ্য, পাঠভবনকে তিনি বেছে নিলেন সে নাটক করার জন্য।

'বাল্মীকি প্রতিভা' ও 'ঋতুরঙ্গ' হবে বলে স্থির হল। বাল্মীকি শান্তিদা, আর দস্যুদল ও বনদেবী পাঠভবনের ছেলে-মেয়েরা।

সেই নাটক প্রস্তুতি, বম্বে যাওয়া এবং বিশেষ করে বাল্মীকির অভিনয় দেখা —সে এক অভিজ্ঞতা। বালিকাটির সঙ্গে বাল্মীকির কথোপকথন, লক্ষ্মী সরস্বতীর সঙ্গে বাল্মীকির অভিনয় এবং তার গান— সে যে কী আশ্চর্য তা বলে বোঝানো যায় না।

'রাঙা পদ পদ্মযুগে' শুনে অভিভূত হয়ে যেতাম। খড়্গ হাতে— 'কি মায়া এ জানে গো'— বলে বাল্মীকি যখন বালিকাটিকে আঘাত করতে ছুটে যেত, অবাক হয়ে ভাবতাম এ কী অসাধারণ চরিত্রের ইন্টারপ্রিটেসন। বাল্মীকি নিজের দুর্বলতায়, নিজের চোখে জল দেখে যেন দায়ী করছে সেই বালিকাটিকে, তাই তার ক্রোধ।

সব ভেসে গেল গো— বলে খড়্গটি মাটিতে নিক্ষেপ করে সে কী হতাশার প্রকাশ।

আজ দুঃখ হয় এই প্রযুক্তির যুগে কেন এ-সব ধরে রাখার ব্যবস্থা হয় নি —এই কথা ভেবে। শান্তিদার তিরোধানের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের বিশেষ একটি ঐতিহ্য লুপ্ত হয়ে গেল। রবীন্দ্র-সংগীতে পৌরুষ, তার ছন্দ লয় ব্যবহারের রীতি, এ আর কোথায় পাওয়া যাবে? কে রক্ষা করবে এই ঘরানা?

আমার চোখে শান্তিদা

প্রভাতকুমার পাল

মানুষের জীবনে এমন কিছু ঘটনা ঘটে যা অত্যন্ত আকস্মিক। আমার পিতৃদেবের মুখেই শুনেছি,— ১৯৩৫ সালে স্বর্গীয় কালীমোহন ঘোষ মহাশয়, শ্রীনিকেতন পল্লী-সংগঠন বিভাগে গ্রামের কাজ পরিচালনার জন্য তাঁকে গ্রাম (বাঁধনবগ্রাম) থেকে নিয়ে এসেছিলেন। সেই তখন থেকেই উক্ত পরিবারের সঙ্গে আমরা পারিবারিক-ভাবে যুক্ত।

দীর্ঘদিন শান্তিদার ছায়াসঙ্গী হয়ে থাকার সুবাদে, তাঁর জীবনবোধ ও জীবনদর্শন সম্পর্কে আমি যেটুকু বুঝেছি, তার কিছুটা তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

প্রথমে আসা যাক ধর্ম সম্পর্কে তাঁর চিন্তাভাবনা প্রসঙ্গে। তাঁর মধ্যে কোনো ধর্মীয় সংকীর্ণতা বা গোঁড়ামি আমার অন্তত চক্ষুগোচর হয় নি। সর্ব ধর্মে তিনি ছিলেন সমান বিশ্বাসী ও শ্রদ্ধাশীল। 'শ্রীশ্রী গীতা' ও 'উপনিষদ' তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। বৈষ্ণবধর্মের প্রতি তাঁর ছিল প্রগাঢ় ভক্তি। বীরভূম জেলার কুড়মিঠা গ্রাম নিবাসী কাব্যতীর্থ শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে, তাঁর গ্রামের বাড়িতে বসে একাধিকবার বৈষ্ণব-ধর্ম সম্পর্কে শান্তিদাকে আলোচনা করতে দেখেছি। বর্ধমান জেলার বৈরাগীতলার মেলায় যেতেন সেখানকার বৈষ্ণব সাধক ও বাউলদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে। বাউল সাধক স্বর্গীয় নবনীদাস মহাশয় ছিলেন শান্তিদার আপন ঘরের লোক। তীর্থদর্শন তাঁর নেশা ছিল। তারাপীঠ, নবদ্বীপ, মায়াপুর, রাজরাপ্পা (বিহার) ছিন্নমস্তা মন্দির, দক্ষিণেশ্বর— এই রকম কত তীর্থক্ষেত্রে আমিই তাঁর সঙ্গী ছিলাম। পাশাপাশি শুধু বীরভূমেই ইসলাম ধর্মীয় স্থানগুলি যেমন, 'পাথর চাপরী' দাতা সাহেব, কুষ্ঠিকুরী শাহ আবদুল্লাহ কেরামতি বাবা দরগা শরীফ, এরকম কত জায়গায় তাঁর সঙ্গে আমি ঘুরেছি। আবার দুর্গাপূজার সময় প্রতি বছর সুরুল, বোলপুর, বাঁধগোড়া ও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে দুর্গাপ্রতিমা দর্শনে তিনি আমাকেই সঙ্গী করতেন। ফেলে আসা সেই দিনগুলি আজ আমার কাছে স্বপ্ন মনে হয়।

অতঃপর আসা যাক গুরুদেবের গানের গায়নরীতি বা গায়কী সম্পর্কে শান্তিদার নিজস্ব উপলব্ধি প্রসঙ্গে।

গুরুদেবের স্বকণ্ঠে যে গানগুলি আমরা শুনেছি বা শুনি এবং তাঁর যে গায়নরীতি, তার যথার্থ উত্তরসুরী ও যোগ্য শিষ্য হিসেবে আমাদের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়ে আছে, স্বর্গত দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শান্তিদেব ঘোষ মহাশয়ের গান।

শান্তিদা বলতেন, গুরুদেবের গান গাইতে হলে গায়কের সাংগীতিক কতকগুলি গুণ থাকা আবশ্যিক। প্রথম হল কণ্ঠস্বরের বলিষ্ঠতা ও মাধুর্য। তিনটি সপ্তকেই গায়কের স্বচ্ছন্দ বিচরণ থাকা প্রয়োজন। সুর, তাল, লয়-এর সম্যক জ্ঞান থাকাটা অবশ্যই জরুরি। তাঁর মতে 'লয়' হল গানের প্রাণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যম। তাই কোনো গানের যথার্থ 'লয়'টিকে চয়ন করতে জানতে হবে। আমার মতে শান্তিদা সত্যই 'লয়'-এর যাদুকর ছিলেন। প্রসঙ্গত বলতে বাধা নেই তিনি যে আরো একটি বিষয়ের উপর যথেষ্ট জোর দিতেন, তা হল, গানের অন্তর্নিহিত ভাব ও অধ্যাত্মবোধের উপলব্ধি। তিনি বলতেন, এই বোধের অভাব থাকলে গুরুদেবের গান অসম্পূর্ণই থেকে যায়। এ ক্ষেত্রে একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ না করলে আমার বক্তব্যটিকে বোধ হয় ঠিকভাবে বোঝানো যাবে না। যেমন— 'ওই আসনতলে, মাটির পরে' গানটি যতবারই তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে, ততবারই গানটি নিছক গান না থেকে একটা কোথাও উত্তীর্ণ হওয়ার আস্বাদ আমাদের দিয়েছে। বিশেষত 'সবার শেষে যা বাকি রয়, তাহাই লব' এই পংক্তিটি যেন চরম আর্তি ঈশ্বরের চরণে পতিত হয়েছে। এখানে কোমল 'ণি' ও 'দা' যে কী নিপুণভাবে তিনি সুরে লাগাতেন, তা গানের গভীরে না গেলে হৃদয়ঙ্গম করা সাধারণ শ্রোতার পক্ষে কঠিন হয়ে যায়। সম্ভবত এই কারণেই শান্তিদা বলতেন, সার্বিক যথেষ্ট অনুশীলন না থাকলে 'রবীন্দ্রসংগীত'-এর অন্তর্নিহিত ভাব-রস গ্রহণ করা কখনই সম্ভব নয়।

শান্তিদা ছিলেন একাধারে সংগীত, নৃত্য, অভিনেতা ও পরিচালক। আবার শিক্ষক হিসেবেও তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ। একটু বিশদভাবে বললে বক্তব্যটি স্পষ্ট হবে। 'বাল্মীকি প্রতিভা'-য় বাল্মীকির, দস্যু বাল্মীকি থেকে ঋষি বাল্মীকির যে উত্তরণ তা এসেছে অধ্যাত্ম চেতনার হাত ধরেই। দস্যু থেকে ঋষিতে যে অসাধারণ উত্তরণ, তা আমরা তাঁর কণ্ঠে ফুটে উঠতে দেখেছি। অধ্যাত্মবোধ ব্যতীত যা সম্ভবপর হত না কখনই।

তিনি যে কত বড়ো-মাপের গায়ক, অভিনেতা ছিলেন, তার উদাহরণ স্বয়ং তিনি নিজেই। 'ফাল্গুনী' নাটকের 'হবে জয় হবে জয়' গানটিই ধরা যাক। উক্ত গানটির একটি পংক্তি 'ওহে বীর হে নির্ভয়' স্বরক্ষেপণের মাধ্যমে আত্মপ্রত্যয়ের যে ছবিটি তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন বা তুলতেন তা অতুলনীয়। পাশাপাশি 'ধীরে বন্ধু ধীরে' গানটির একটি পংক্তি, 'চলব আমি নিশীথ রাতে', শান্ত, স্নিগ্ধ রাত্রির যে গভীরতা তা তাঁর বিশেষ গায়নরীতির গুণেই হয়ে উঠেছে যথার্থ।

স্বয়ং শ্রষ্টার যে গায়নরীতি, রূপে, রসে, স্বাদে ও গন্ধে— যা কানায় কানায় পূর্ণ, কিংবদন্তী শেষ সাধক আমার শান্তিদার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে সেই রীতির তথা গায়কীর সমাপ্তি ঘটল।

গুরু শান্তিদাকে যেমন দেখেছি ও জেনেছি

বিজয়কুমার সিংহ

শান্তিনিকেতন সম্পর্কে আমি একেবারেই অজ্ঞ ছিলাম। আমি একটু আধটু গান গাইতাম। পরিচিত কয়েকজন আমাকে বললেন, শান্তিনিকেতনে সংগীতভবনে গিয়ে ভর্তি হয়ে যান। ভাবলাম কিভাবে কী করব বা যাব এরকম একটা দ্বন্দ্ব মনের মধ্যে কাজ করছে। চিঠি লিখলাম শান্তিবাবুকে। এখানে দাদা ও দিদির ব্যাপারটা আমার আদৌ জানা ছিল না। শান্তিবাবু লিখলেন ভর্তির পরীক্ষা দিতে হবে। পরীক্ষায় গুরুদেবের একটি গান ও একটি হিন্দি গান গাইতে হবে। হিন্দি গান তো আমি জানি না। আবার চিঠি দিলাম, একই উত্তর। শান্তিবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই বলে চিঠি দিলাম। উনি লিখলেন অমুক দিন এসো। এসে শুনলাম উনি কলকাতায় গেছেন, দুই/একদিন থাকবেন। সাগরময় ঘোষের ঠিকানা দেওয়া হল আমাকে। পরের দিন সকালেই গিয়ে দেখা করলাম। বললাম আমি খুব চিন্তায় পড়ে গেছি, উনি বললেন কেন? বললাম হিন্দি গান তো আমি জানি না। হাসতে হাসতে বললেন, classical গান জান? বললাম দুই/একটা জানি। বললেন ঐগুলো ভালো করে অভ্যেস করো। আমি তখন আমার আর্থিক দুরবস্থার কথা সব বললাম। উনি বললেন scholarship আছে চেষ্টা করো। ১৯৬৯ সালে ভর্তি পরীক্ষা দিলাম, ছাত্র-ছাত্রী অনেকেই ছিল। পরীক্ষার পর আমিও শান্তিদা বলে প্রণাম করে জানতে চাইলাম আমার হবে কি না। শান্তিদা বললেন চিন্তা কোরো না, চিঠি পেয়েই তাড়াতাড়ি চলে এসো।

১৯৬৯ সালে জুলাই মাসের ২৮ তারিখ সংগীতভবনে ভর্তি হই ছাত্র হিসেবে। আমাদের রবীন্দ্রসংগীতের ক্লাস নেবেন শান্তিদা ও উচ্চাংগ সংগীতের ক্লাস নেবেন সুধীশদা (সুধীশ ব্যানার্জি)। প্রথমদিন দেখলাম বিশাল লম্বা চওড়া এক ব্যক্তিত্ব বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন। পরনে ধুতি, কোঁচা ঝোলানো, গায়ে কলিদার পাঞ্জাবী ও হাতে দুটি মোটা মোটা ফাইল নিয়ে গট্ গট্ করে এসে গম্ভীরভাবে সংগীতভবনে ঢুকলেন। চারিদিকে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। সকলেই যেন তটস্থ। ভাবলাম কী ব্যাপার! ক্লাস শুরু হল। প্রথম গান 'ফিরে চল্ মাটির টানে।' গানটা লিখিয়ে দেওয়ার পর হারমোনিয়মে 'সা, পা স্বর দিয়ে চড়া স্কেলে আপন মনে চোখ বন্ধ করে আট/দশবার

গানটা গেয়ে গেলেন। আমরা সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করছি। পরে বললেন, এবার তোমরা গাও দেখি! লক্ষ করলাম কী বলিষ্ঠ জোরালো কণ্ঠ, কী অদ্ভুত স্বরক্ষেপণ, ভাব, তাল, লয় ও ছন্দের সমন্বয়, কথার ঝোঁক ও গানের স্পিরিট। পূর্বে কোনোদিন গুরুদেবের গান এভাবে শুনি নি। ঠিক লাইন ধরে ধরে শান্তিদা কোনোদিন গান শেখাতেন না। ক্লাসের মধ্যে বা পরে বাড়িতে গিয়ে যখন জিজ্ঞাসা করতাম কী কী স্বর লাগছে বা স্বরলিপিটা কি হবে, তখন বেশ বিরক্তির সুরে বলতেন ও-সব দিকে নজর না দিয়ে গানটা শুনে শুনে মনে বসাবার চেষ্টা করো। পরবর্তীকালে তাঁর সঙ্গে নানা কথার মাধ্যমে জানলাম গুরুদেবের শিক্ষা পদ্ধতিটা ছিল এইরকম। ছাত্রাবস্থায় উপলব্ধি করলাম খুব রাসভারী, জেদি ও মেজাজী মানুষ। ছাত্রাবাস, ছাত্রীনিবাসের নানা সমস্যা, সংগীতভবনের নানারকম উন্নয়নমূলক কাজ, অনুষ্ঠানে, সংগীতভবনের ছাত্র-ছাত্রীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের ব্যাপারে যখনই গেছি প্রথমে কিছু বকুনি ও তর্কবিতর্কের পর পরই সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন। এই চার বছরের অজস্র ঘটনা এখনো সাক্ষী হয়ে আছে ও থাকবে।

বিভিন্ন অনুষ্ঠান কিভাবে পরিচালনা করতেন স্বচক্ষে তা দেখেছি। তখন 'চিত্রাঙ্গদা', 'শ্যামা' ও 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্য বসন্তোৎসবের দিন রাতে মঞ্চস্থ হওয়ার পূর্বে কমপক্ষে দেড় দু'মাস ধরে মহড়া চলত। একমাস ধরে বিভিন্ন শিক্ষক-শিক্ষিকা পৃথক পৃথকভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের নাচ ও গানের তালিম দিতেন। ছেলেদের গানগুলি সাধারণত শান্তিদা ও বীরেনদার (বীরেন পালিত) কাছেই আমরা শিখতাম। এর পর প্রায় একমাস ধরে সমস্ত বাদ্যযন্ত্র সহযোগে সংগীতভবন মঞ্চে মহড়া চলত। সামনে মঞ্চের ঠিক মাঝখানে বসে শান্তিদা গানগুলো কিভাবে গাইতে হবে তা গেয়ে গেয়ে শোনাতেন এবং নাচগুলো ঠিক না হলে কিভাবে করাতে হবে শিক্ষকদের ডেকে সঙ্গে সঙ্গে বুঝিয়ে দিতেন। ছাত্র-ছাত্রীরা ছাড়াও মাঝে মাঝে নৃত্য শিক্ষকরাও প্রধান চরিত্রে অংশগ্রহণ করতেন। সব অনুষ্ঠানেই ছেলেদের পৃথক নাচ রাখার নির্দেশ তিনি দিতেন। এইরকম শিক্ষা পদ্ধতির ক্ষমতা ও দক্ষতা আর কারোর মধ্যে এখন লক্ষ করা যায় না। মহড়ার সময় দেরি হলে বকুনির হাত থেকে কেউই রেহাই পেত না। চারটের সময় মহড়া হলে অন্তত আধ ঘণ্টা বা তার আরো আগে শান্তিদা চলে আসতেন। পর পর চলে আসতেন এস্রাজের শ্রদ্ধেয় অশেষদা, নির্মলদা, খোল, তবলা-পাখোয়াজের অনাদিদা ও সঞ্জয়দা এবং নৃত্যশিক্ষকরা। চারিদিকে তখন থেকেই একটা উৎসবের মেজাজ। অনুষ্ঠানের সপ্তাহখানেক আগে থেকে কলাভবনের শিক্ষকরা নিয়মিত মহড়ায় এসে মঞ্চসজ্জা, পোশাক, আলো প্রভৃতি সম্পর্কে শান্তিদার কাছ থেকে জেনে নিতেন।

শান্তিদা তখন অধ্যক্ষ ও রবীন্দ্রসংগীত এবং নৃত্যের প্রধান। অধ্যক্ষের পৃথক

কোনো ঘর ছিল না। দপ্তরের বেঞ্চে বসে চিঠিপত্র যা যা করার নির্দেশ দিতেন। ছাত্র-ছাত্রী ও অন্যান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ বা যার যা বক্তব্য ওখানেই হত। ঐ রকম রাসভারী ব্যক্তিত্বের সামনে সাধারণত ছাত্র-ছাত্রীরা যেতে সাহস পেত না ; সবাই আমাকে পাঠাত বা সঙ্গে যেতে হত। বিভিন্ন ব্যাপারে দপ্তরে, ক্লাসরুমে এমন-কি বাড়িতেও আমার ডাক পড়ত। ছাত্রাবস্থায় অনেকবারই বলেছেন অনুষ্ঠান সূচি তৈরি করতে ; তাতে কিছু কিছু পরিবর্তন করে মহড়া ও অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বও দিয়েছেন।

আমার একটি হারমোনিয়ম ছিল, সেটা নিয়ে ভয়ে ভয়ে কদমতলা ছাত্রাবাসে গান অভ্যেস করতাম। কারণ তখন ক্লাসে তানপুরা বা হারমোনিয়মে সা, পা সুর দিয়ে গান শেখানো হত। সংগীতভবন থেকে বাড়ি যাওয়ার পথে শান্তিদা আমাকে ডেকে বললেন এখনি একবার আমার বাড়িতে এসো। সেটা ছিল ১৯৭০ সাল। বাড়িতে গেলাম, উনি বললেন, তুমি হারমোনিয়ম বাজাও? ভয় পেয়ে ঘাবড়ে গিয়ে বললাম একটু আধটু বাজাই। আর কি বাজাতে পারি জিজ্ঞাসা করলেন ; বললাম চার্চে অর্গান বাজাতাম ও পিয়ানো একটু বাজাতে পারি। শান্তিদা বললেন কলকাতায় আমার গান আছে। তুমি আমার সঙ্গে গিয়ে বাজাতে পারবে? শুনে ভয়, শঙ্কা ও আনন্দে কিরকম যেন হয়ে গেলাম। এ যেন পরম সৌভাগ্য। বললাম চেষ্টা করব শান্তিদা। পরের দিন হারমোনিয়ম নিয়ে শান্তিদার পড়ার ঘরে গেলাম, বেশ কয়েকদিন মহড়া চলল। প্রত্যেকটা নোট ঠিকভাবে, জোর দিয়ে, ছন্দ রেখে, ঝোঁক দিয়ে, কর্ড দিয়ে বাজাতে বললেন। কলকাতায় ইউ. এস. আই. এস. লাইব্রেরিতে শান্তিদা গানগুলি গাইলেন। অসাধারণ সে গান। সেদিন বুঝলাম সংগীত শিক্ষক অনেকেই হন, কিন্তু একাধারে শিক্ষক ও শিল্পী খুব কম জনেই হয়। শান্তিদা ছিলেন তার মধ্যে এক অনন্যসাধারণ। তার পর থেকে শান্তিদার ক্লাসে যে স্কেল চেঞ্জ হারমোনিয়মটি ছিল সেটা একমাত্র আমাকেই বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বাজানোর জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন। ১৯৭৩ সালে পরীক্ষার শেষে শান্তিদাকে প্রণাম করে কলকাতায় বাড়িতে ফিরে গেলাম। ভাবছি এখন কী হবে, কী করব। হঠাৎ একদিন সামনের বাড়িতে শান্তিদা ট্রাঙ্ককল করলেন। বললেন টেলিগ্রাম পেয়েছ? বললাম না, কিসের টেলিগ্রাম? বললেন সংগীতভবনে তোমার জন্য একটা পার্ট টাইম কাজের ব্যবস্থা করেছি, তবে মাইনে বেশি নয় মাত্র দেড়শো টাকা। স্বর্গের চাঁদ হাতে পাওয়ার মতো অবস্থা। কোনোদিন ভাবি নি শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা করব। টেলিগ্রাম পাওয়ার পর এসে শান্তিদার সঙ্গে দেখা করে প্রণাম করলাম, খুব খুশি। বললেন আমার ও পাঠভবনের কিছু কিছু ক্লাস তোমাকে নিতে হবে আমার ক্লাসঘরেই। এছাড়া নিয়মিত তুমি আমার কাছে এসে গান শুনবে ও শিখবে। ১৯৭৩ সালের ২০ ডিসেম্বর তারিখে

সংগীতভবনের কাজে যোগ দিলাম। শান্তিদাকে সংগীতভবনে আসতে না দেখে জানতে পারলাম উনি অবসর নিয়েছেন। খুবই বিমর্ষ হয়ে পড়লাম। সংগীতশিক্ষা শুরু হল। একের পর এক গান তিনি কয়েকবার করে গেয়ে যেতেন, আমিও হারমোনিয়ম বাজিয়ে যেতাম। বলতেন গানটা কিভাবে গাইছি, কথাগুলো কিভাবে বলছি, কোথায় ঝোঁকটা পড়ছে, কোথায় মোলায়েম করছি, সুরটা কিভাবে লাগাচ্ছি, এইভাবে মনে বসাবার চেষ্টা করো। সে এক অপূর্ব শিক্ষা ও অনুভূতি। জীবনে এরকম সুযোগ কজন পায়। গুরুমুখী শিক্ষা এইভাবেই হয়।

পাঠভবনের ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে 'বাল্মীকি প্রতিভা' গীতিনাট্য হবে স্থির হল। প্রায় সপ্তা তিনেক ধরে আমাকে হারমোনিয়মে সব গান তোলালেন ও শেখালেন। ক্রীড়াবিভাগের পাশে আমার ক্লাসরুমে এসে কয়েকদিন ছাত্র-ছাত্রীদের মহড়া নিলেন, তার পর আমাকে বললেন গানগুলো ওদের অভ্যেস করাতে। তার পর প্রায় মাস দেড়েক শান্তিদার বাড়িতে ও সংগীতভবন মঞ্চে মহড়া চলার পর বর্তমান পাঠভবনের শমীন্দ্র পাঠাগারের সামনে সিংহসদনের দিকে মুখ করে প্রায় পঁয়ত্রিশ/ছত্রিশটা তক্তাপোশ পেতে 'বাল্মীকি প্রতিভা' মঞ্চস্থ হল। কলাভবনের শিক্ষকরা মঞ্চসজ্জা, পোশাক-আশাক, আলো প্রভৃতিতে সাহায্য করলেন। দস্যুদলের পোশাক, প্রথম দস্যুর পোশাক, বাল্মীকির পোশাক সব পৃথক পৃথক। সখীদের গান ছাড়া সব গানই বিভিন্ন চরিত্রে যারা অংশগ্রহণ করেছিল তারাই মঞ্চে গেয়েছে। ছয়-সাতটি স্কেলে গান হয়েছে। বাজানো খুবই দুরূহ ব্যাপার। কলকাতা থেকেও ঐদিন রবীন্দ্রসংগীতের কয়েকজন খ্যাতনামা শিল্পীও দেখতে এসে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। ১৯৭৫ সালেই ঐ একই দল বোম্বের দু/তিনটে রঙ্গমঞ্চে ও ফেরার পথে রবীন্দ্রকানন ও রবীন্দ্রসদনে মঞ্চস্থ করে। এইভাবে 'ফাল্গুনী', 'তাসের দেশ' ও অন্যান্য বিভিন্ন নাটকের গানও শিখেছি। 'বাল্মীকি প্রতিভায়' বাল্মীকির গান ও অভিনয়, 'ফাল্গুনী' নাটকে অন্ধ বাউলের গান, অভিনয় ও নাচ, 'তাসের দেশ'-এ রাজপুত্রের গান, নাচ ও অভিনয় না দেখলে কল্পনা করা যাবে না কি অসাধারণ দক্ষতাই না তাঁর ছিল। একত্রে তিনটে জিনিস করা কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়। এই নটরাজের জন্যই বোধ হয় এগুলির সৃষ্টি। বাউল নাচও যেন তাঁর মজ্জায় মজ্জায় মিশে গিয়েছিল। 'শ্যামলী' বাড়ির সামনে দূরদর্শনের জন্য শান্তিদা পুরো বাউলের পোশাকে 'বসন্তে ফুল গাঁথল' গানের সঙ্গে বিভিন্ন ছন্দে নাচটি করেছিলেন। কোনো বাউল ঐভাবে পারবে কি না সন্দেহ।

নাচের ব্যাপারেও তাঁর পরীক্ষানিরীক্ষার শেষ ছিল না। ১৯৭১ সালে মালয়েশিয়া থেকে এক ছাত্রী এল নৃত্যশিক্ষার জন্য। শান্তিদাকে বললাম ছাত্রীটি ব্যালে নাচ জানে। দেখার পর শান্তিদা ঐ বছর 'চলে যায় মরি হায়' গানের সঙ্গে তাকে

ব্যালে স্টাইলে বসন্তোৎসবে গৌরপ্রাঙ্গণ মঞ্চে নাচতে বলেন। পরে 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যে মদনের সব গানগুলি ব্যালে স্টাইলে করালেন। দু-বারই আমাকে দায়িত্ব দিলেন গানের অর্থ বুঝিয়ে ছাত্রীটিকে অভ্যেস করানোর জন্য এবং শান্তিদা বলে দিতেন কিভাবে করতে হবে। প্রতিবারই সবাই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। বসন্তোৎসবে 'ওরে গৃহবাসী' ও বৃক্ষরোপণে 'মরুবিজয়ের কেতন উড়াও' গান দুটির সঙ্গে প্রশেসনে যে নাচ হয়, গুরুদেবকে বলে শান্তিদা সহজ ছন্দ ও নৃত্যভঙ্গিমায় এর প্রচলন করেছিলেন। এ তথ্য অনেকের জানা আবার অনেকের অজানা।

কাজের সময় শান্তিদা ছিলেন বজ্রকঠিন ঠিকই কিন্তু অন্য সময় একেবারে খোসমেজাজি মানুষ। অন্তরের কোমল স্বভাবের দিকটায় ছিলেন অন্য শান্তিদা। এই রসিক মানুষটিকে আমরা অনেকেই চিনতে ভুল করেছি। পাঠভবনের ছাত্র-ছাত্রীদের ভীষণ ভালোবাসতেন ও স্নেহ করতেন। বাড়িতে গেলে অনেক সময় ধরে তাদের সঙ্গে খোসমেজাজে গল্প, রসিকতা ও নানারকম খোঁজখবর নিতেন। অনেকদিনই আমার খোঁজে পাঠভবন দপ্তরে এসে না পেলে ক্লাসরুমে যাওয়ার পথে হঠাৎ দেখতাম চৈতী বা দিনান্তিকা বা বেণুকুঞ্জের কাছে পাঠভবনের ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁকে ঘিরে আছে। শান্তিদা তাদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টায় মেতে আছেন।

গুরুদেবের গানই ছিল শান্তিদার প্রাণ ও অনুপ্রেরণা ; এর থেকে কোনোদিন বিরত হন নি বা অবহেলা করেন নি। অবসর গ্রহণের পর নিয়মিত প্রতিদিন সকালে এক ঘণ্টা ধরে গান অভ্যেস করতেন। কোনো অনুষ্ঠানে যদি একটাই গান গাইতে হত তার মহড়া চলত কমপক্ষে ছয়/সাতদিন ধরে। একবার গেয়ে ক্ষান্ত হতেন না। প্রতিদিন ঐ একটা গানই আট/দশবার গাইতেন। কোনো জায়গায় গান গাইতে হবে শুনলে ভীষণ খুশি হতেন। গানের ব্যাপারে বয়স তাঁর কাছে কোনোদিনই বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি। শান্তিনিকেতনে বা অন্যত্র কেউ একদিন আগে গান গাইবার অনুরোধ জানালে তাঁকে বা তাঁদের কথা শুনতেই হত। বকাঝকা করবেন কিন্তু গান তিনি ঠিকই গাইবেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের বলতেন বা অন্য কাউকে বলতেন আমাকে খবর দিতে, খুব জরুরি দরকার ; সঙ্গে সঙ্গে যেতে হত, বলতেন গান আছে, কখন মহড়া দিতে আসবে। টেলিফোন আসার পর আরো সুবিধা হল। বেতার, দূরদর্শন বা বাইরে অনুষ্ঠানের কথা হওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে জানাতেন, খুব জরুরি দরকার, এক্ষুনি এসো। সেই একই কথা, গল্প ও কফি খাওয়া। অনেকেই বলতেন এই একজন মানুষ বকা-ঝকা করুন আর যাই বলুন, একদিন আগে গেলেও গান গাইব না একথা একবারও বলতেন না।

৭ই পৌষ ছাতিমতলার উপাসনা, বসন্তোৎসবে গৌরপ্রাঙ্গণ মঞ্চে ও ১লা বৈশাখ মন্দিরে সাধারণত প্রথম গানটি শান্তিদা গাইতেন। এই-সব অনুষ্ঠানের দশ/

পনেরো দিন আগে থেকেই বলতেন, কি ব্যাপার বল তো। এখনো গান গাইবার কথা তো কেউ বলছে না। আমি বলতাম খবর নেব, বা জিজ্ঞাসা করব। বলতেন না, না। দেখি কি করে ; এবার বোধ হয় আমাকে বাদ দেবে। বলতাম অত চিন্তা করছেন কেন ; আপনাকে বাদ দেওয়ার ক্ষমতা কারো আছে। যখনই খবর পেতেন গাইতে হবে, কি খুশিই না হতেন। অবসর গ্রহণের কয়েক বছর পর কলকাতা ও বাইরে বহু জায়গায় শান্তিদা গান গাইতে গেছেন। রবীন্দ্রসংগীত পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমিতাভ ঘোষ মহাশয় প্রথম ব্যক্তি যিনি শান্তিদাকে দিয়ে কলকাতার রবীন্দ্রসদন, কলামন্দির, মহাজাতিসদন, বিড়লা একাডেমী, বিড়লা হল প্রভৃতি স্থানে একক অনুষ্ঠান করিয়েছেন। কয়েকটি জায়গায় অনুষ্ঠান করানোর আগে তাঁকে নানাভাবে হেনস্থাও করা হয়েছে। তিনি অটল থেকেছেন সর্বদা। অনুষ্ঠান শেষে শান্তিদাকে সাধ্যমতো সম্মান-দক্ষিণা দিয়েছেন এবং আমরা যারা তাঁর সঙ্গে সংগত করতাম, শান্তিদা তা থেকে আমাদের প্রত্যেককে পারিশ্রমিক হিসেবে ভালো অর্থই দিয়েছেন। প্রতি অনুষ্ঠানে একটানা এক ঘণ্টা, দেড় ঘণ্টা বা তারো বেশি সময় গান গেয়ে গেছেন। বিভিন্ন ধরনের গান গেয়েছেন। গান অনুযায়ী বিভিন্ন স্কেলে গাইতেন। অনেক সময় গানের শুরুটা বাজানোর পর গান ধরতেন, আবার বেশিরভাগ সময় স্কেল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ধরে ফেলতেন। অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। অর্থাৎ দেরি চলবে না। গানের বিভিন্ন কলির মাঝে (Interlude) সাধারণত কোনো বাজনা বাজাতে হত না। অন্যান্য শিল্পীদের মতো অনুষ্ঠানে গান গাইবার জন্য সম্মান-দক্ষিণার বিরাট অঙ্কের অর্থের চাহিদা তাঁর কোনোদিনই ছিল না। গত বছর তাঁর ঘনিষ্ঠ কোনো এক ব্যক্তিকে লেখা কিছু চিঠিপত্র পড়ে জানতে পারলাম কেবলমাত্র সাংসারিক প্রয়োজনে বাধ্য হয়েছেন এই দক্ষিণা গ্রহণ করতে। চিঠিগুলি পড়ে বুঝলাম শেষ কিছু বছর তাঁর বেশ কষ্টে সময় কেটেছে। তবে কাউকে কোনোভাবে বুঝতে দেন নি। কিছু হলেই বলতেন চিন্তার কিছু নেই, গুরুদেব আছেন। আর সত্যিই তাই, কিভাবে, কোথা হতে সব এসে যেত। অবসর নেওয়ার অনেক অনেক বছর পরে শান্তিদার পেনসনের ব্যাপার ঠিক হয় ; এ নিয়ে অনেক ঝামেলাও হয়েছে।

প্রায়ই বলতেন গুরুদেব বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন রসের বিভিন্ন ভাব ও ছন্দের গান রচনা করেছেন। জনসমক্ষে ঠিকমতো গেয়ে প্রকাশ করতে না পারলে কোনো লাভ নেই। যেমন ধরো 'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু' গানটি— দুঃখ, মৃত্যু আছে বলেই কেঁদে কেটে গাইবে কেন? পরের কথা তবুও শান্তি, তবু আনন্দ— এই অর্থ, এই দর্শনটা মনে রেখে গাইতে হবে। 'তোমায় নতুন করে পাব বলে'— এটাও কান্নার গান নয়। বার বার হারাবার পর নতুন করে পাওয়ার আনন্দ— এই ভাবটাই ফোটাতে হবে। 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে'— মোটেই মোলায়েম করে গাইবার

গান নয়। এভাবে বহু গানের কথা বলেছেন ও বার বার গেয়ে শুনিয়েছেন। 'গীতিনাট্য', 'নৃত্যনাট্য' ও নাটকের গান যেভাবে গেয়ে শোনাতেন তা কারোর পক্ষে সম্ভব বলে মনে হয় না।

যখনই কোনো অনুষ্ঠানে গান গাইতে যেতেন সব সময় আগে থেকে একটা বিষয় নিয়ে অনেক ভাবনা চিন্তা করে গানগুলো বাছতেন। পাঁচমিশালী গান কখনো করতেন না এবং এর বাইরে শ্রোতাদের অনুরোধে একমাত্র 'কৃষ্ণকলি' ছাড়া অন্য কোনো গান গাইতে চাইতেন না। অনেক সময় বাড়িতে চোখ বন্ধ করে বহুক্ষণ গান গাইবার পর বলতেন, বুঝলে! গুরুদেব গান গাইতে গাইতে এমন একটা জায়গায় পৌঁছতেন, সেটা কোনোদিন পারলাম না। কোনো অনুষ্ঠানে গুরুদেবের রেকর্ড করা গান গাইবার জন্য শান্তিদাকে অনুরোধ জানালে কোনোদিন গাইতে চাইতেন না, বলতেন গুরুদেব যেভাবে গেয়েছেন সেভাবে গাইবার ক্ষমতা আমার নেই, দয়া করে আমাকে অনুরোধ করবেন না।

সাধারণত গান পরিবেশনের অনেক আগে প্রতিটি গান বড়ো বড়ো অক্ষরে পৃথক পৃথক পৃষ্ঠায় লিখে লাল কালি দিয়ে কথার উপরে স্বরলিপি, তালের ভাগ, রাগিণী, কিছু কথা বা বর্ণের উপরে ও নীচে দাগ দেওয়া থাকত। গান ছাড়া আবৃত্তিও করতেন বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে। পুরো কবিতা ঠিক পৃথক পৃথক পৃষ্ঠায় লিখে কোন্ শব্দ বা বর্ণের উপর ঝোঁক দিতে হবে, থামতে হবে, মোলায়েম করতে হবে, জোরালোভাবে বলতে হবে, সব নানারকম চিহ্ন দিয়ে লিখে সেইভাবে বহুবার অভ্যেস করার পর আবৃত্তি করতেন, তারো একটা বিশেষ ছন্দ থাকত।

গুরুদেব ছিলেন তাঁর ধ্যান-জ্ঞান ও স্বপ্ন। মনেপ্রাণে গুরুদেবের প্রতি তাঁর ছিল অগাধ শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও বিশ্বাস। এতে কোনো ভেজাল ছিল না। বলতেন তোমাদের নানা দেব-দেবী আছেন, ভগবান আছেন, বড়ো বড়ো নেতা আছেন ভগবানের মতো, আমার কাছে গুরুদেবই সব। গুরুদেব সম্পর্কে বহুবার বহুজন জানতে এসেছেন। কোনো দ্বিধা না করে শরীর খারাপ থাকলেও সঙ্গে সঙ্গে গড়্ গড়্ করে সাল, তারিখ সমেত কিভাবে কি করেছেন, কিভাবে কি ঘটেছে, মুখস্থের মতো বলে যেতেন। আমিও অবাক হয়ে শুনতাম। তবে গুরুদেব সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করলে কেউ রেহাই পেতেন না। হয় সামনাসামনি নচেৎ লিখিতভাবে তার তীব্র প্রতিবাদ জানাতেন। কাউকে ছেড়ে কথা বলেন নি। স্পষ্ট বক্তা, চিরদিন অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন একা। কাউকে পরোয়া করেন নি কোনোদিন। তাইতো তিনিই রবীন্দ্রসান্নিধ্যধন্য একমাত্র শিষ্য ও ভক্ত, যিনি একাধারে সংগীত, নৃত্য, অভিনয় ও আবৃত্তিতে বিশেষ পারদর্শী হতে পেরেছিলেন। স্বয়ং গুরুদেব ও দিনেন্দ্রনাথের কাছে তালিমপ্রাপ্ত শিক্ষক ও শিল্পী, যাঁর কণ্ঠের গান ও গায়কী

অননুকরণীয়। উচ্চাঙ্গ সংগীতের শিক্ষা পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রীর কাছে। এস্রাজ, বীণা ও মৃদঙ্গবাদনও দক্ষতার সঙ্গে রপ্ত করেছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন লোকনৃত্য, কথাকলি, মণিপুরী ও ক্যান্ডি নৃত্যেও অনন্যসাধারণ ছিলেন।

মাঝে মাঝে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ ও বিভিন্ন জায়গা, এমন-কী বিদেশ থেকে অনেক মিশনারী ফাদাররা আমার কাছে আসতেন। তাঁদের অনেককেই শান্তিদার কাছে নিয়ে গিয়েছি, ভীষণ খুশি হতেন ; গুরুদেব, এ্যান্ড্রুজ ও পিয়ার্সনের নানা কথা তাঁদের শোনাতেন। কয়েকজনের মধ্যে দুজন খুব জ্ঞানীগুণী ফাদার আঁতোয়ান ও ফাদার ফালোঁর সঙ্গে কয়েকবারই সাক্ষাতে অনেক কথাবার্তা হয়েছে এবং শান্তিভবন নামে যে বাড়িতে তাঁরা থাকতেন সেখানে দুবার গানের মহড়ার ব্যবস্থাও করেছিলাম। পূর্বপল্লীতে মাদার টেরেজাকে যে বাড়িটি দান করা হয়েছে তার ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠানের জন্য ১৯৯৫ সালে মাদারকে আনার ব্যবস্থা করলাম। শান্তিদা শুনে বললেন আমাকে নিয়ে যেও একটু আলাপ করব। আমি বললাম নিয়ে যাব কী, আপনাকে গান গাইতে হবে। অসম্ভব খুশি হলেন। আমাকে বললেন তুমি একটা গান বেছে দিও, সেটা গাইব। চিন্তায় পড়ে গেলাম। গীতবিতানের পাতা উল্টে উল্টে একটা গান বাছলাম। 'শুনেছে তোমার নাম, অনাথ আতুর জন।' বললেন দারুণ গান বেছেছ। মাদার আসতে তাঁর পাশে বসালাম, কথাবার্তা হল। শান্তিদার তেজোদীপ্ত কণ্ঠে গান শুনে মাদার একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

শেষের দিকে কয়েক বছর স্পনডেলাইটিসের জন্য চলা-ফেরা, ওঠা-বসা, রিক্শায় ওঠা-নামা সব ব্যাপারে বেশ কষ্ট হত। কিছুক্ষণ গান গেয়ে থেমে যেতেন। এ-সব দেখে বহুবারই হাসি বৌদি (শ্রীমতী ইলা ঘোষ, সহধর্মিনী) ও আমি বলেছি এবার বাদ দিন, পরের বার যাবেন। এই নিয়ে অনেক অশান্তিও হয়েছে বৌদির সঙ্গে। বলতেন গান গাইতে আমি যাবই, কেউ আমাকে থামাতে পারবে না, এবং যেতেনও। দুটি ঘটনা আমাকে বলতেই হবে। একবার রবীন্দ্রকানন-এ গান গাইতে গাইতে দেখি কথা জড়িয়ে যাচ্ছে, আওয়াজ কি রকম লাগছে এবং পরক্ষণেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাচ্ছেন ; সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেললাম ; সবাই চিন্তিত ও তটস্থ হয়ে পড়েছেন। চারিদিকে লোকজন, টি.ভি-র ভীড়-ভাট্টা শুরু হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পর উঠে বসে বললেন কি হয়েছে? নাও আবার শুরু করে দাও। তখন সবাই বললেন শান্তিদা আপনাকে এখন আর গান গাইতে হবে না, বিশ্রাম করুন। দ্বিতীয়বার আকাশবাণী স্টুডিয়োতে রেকর্ডিং হতে হতে একই অবস্থা। ধরাধরি করে কিছুক্ষণের মধ্যে জ্ঞান ফেরার পর জিজ্ঞাসা করলেন কি হয়েছে? বৌদি ও আমরা বললাম আগের মতোই ঘটনা ঘটেছে। দুটো গান বাকি ছিল, কোনো কথাই শুনলেন না ; একটু বিশ্রাম নিয়ে কফি খেয়ে গান দুটো গেয়ে তার পর ক্ষান্ত হলেন। ১৯৯৮ সালে অসুস্থ হয়ে ডিসেম্বর মাসে

এস. এস. কে. এম. হাসপাতালে ভর্তি হলেন। মনের মধ্যে সব সময় চিন্তা পৌষ মেলার। ডাক্তারদের বললেন ৭ই পৌষের আগে আমি যাতে ফিরে যেতে পারি তার চেষ্টা করুন। আসতে না পারলেও ৭ই পৌষ নিজের বিছানায় বসে সুরপেটি বাজিয়ে আপন মনে কতকগুলি গান গেয়ে গেলেন, শ্রোতা বেশ কিছু ডাক্তার ও নার্স। গুরুদেবের গান তাঁর নিত্য সঙ্গী, অনুপ্রেরণা ও প্রাণ। কোনো অবস্থাতেই কেউ তাঁকে থামাতে পারে নি।

জানার আগ্রহ ছিল তাঁর প্রবল। ছোটো-বড়ো যে মাপের ব্যক্তিই হোক না কেন সাক্ষাতে সমস্তরকম খবরাখবর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করতেন ও সবকাজে সবাইকে বিশেষভাবে উৎসাহ দিতেন।

কেউ ফোটো তুলতে চাইলে যেভাবে যে পোশাকে থাকতেন তাতেই রাজি হয়ে যেতেন। খাওয়া-দাওয়ার বিশেষ কোনো বাছ-বিচার ছিল না। খেতে যেমন পছন্দ করতেন, অন্যদের খাওয়াতেও খুব ভালোবাসতেন। সামাজিকতার কোনো ঘাটতি ছিল না। নিমন্ত্রণ রক্ষা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপার ছিল। নিজের জন্মদিনের আগে পছন্দমতো পরিবারকে স্বয়ং নিজে বাড়িতে গিয়ে নিমন্ত্রণ করে আসতেন। চলাফেরার অসুবিধা থাকলেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নি কোনোদিন। কফি ও পান-জর্দা তাঁর খুব প্রিয় ছিল। ডাক্তারের নির্দেশে কড়াকড়ি হলেও অন্যত্র গিয়ে খাওয়ার বিরাম ছিল না। এ নিয়ে বাড়িতে হাসি বৌদির সঙ্গে নানারকম অশান্তিও করেছেন। আমার বাড়িতে বহুবার এসে কফি খেয়েছেন। তার পর চল্লিশ/পঁয়তাল্লিশ মিনিট বা ঘণ্টাখানেক ধরে গুরুদেবের নানা কথা, অন্যান্য অনেক ধরনের আলোচনা করার পর উঠতেন। একদিন বললেন আমার মানি ব্যাগটা খোলো। ইতস্তত করছি, বললেন কিছু পেলে? দেখি একটা কোণায় ছোট্ট প্যাকেটে মোড়া জর্দা। বললাম শান্তিদা এগুলো না খেলেই তো হয়। পরক্ষণে হাসতে হাসতে বললেন তুমি please বাড়িতে কিছু বোলো না। বাড়িতে খাওয়ার টেবিলে বসে রসিকতারও শেষ ছিল না।

শেষ ক' বছর গেরুয়া লুঙ্গি, কোনো সময় ফতুয়া, কোনো সময় কলিদার পাঞ্জাবী, মাথায় টুপি ও হাতে একটি লাঠি নিয়ে চলাফেরা করতেন। প্রেসিডেন্ট বা মন্ত্রীদের বা যে কোনো অনুষ্ঠানে এই পোশাকের কোনো পরিবর্তন হয় নি। খুব সহজ, সরল, সাধারণ অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার মানুষ ছিলেন।

বিগত কয়েক বছর ধরে সরকারের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে তিনি তাঁর মূল্যবান উপদেশ ও পরামর্শ দিয়েছেন। সাংসদ সোমনাথবাবুর সঙ্গে ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠতা খুব বেড়ে যায়। আশ-পাশের গ্রামে ও অন্যত্র সোমনাথবাবুর আমন্ত্রণে সংগীত পরিবেশনের ডাক পেয়ে তিনি উপস্থিত হয়েছেন পরমানন্দে। মানুষের সামান্যতম উন্নয়নমূলক কার্যে তিনি যারপরনাই খুশি হয়েছেন। কাছাকাছি গ্রামে জল

সরবরাহের ব্যবস্থা হচ্ছে শুনে আমন্ত্রণ পেয়ে তাঁর বলিষ্ঠ কণ্ঠে গেয়েছেন 'এসো এসো হে তৃষ্ণার জল।' শান্তিনিকেতনের অদূরে "গীতাঞ্জলি" রঙ্গমঞ্চের ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর উপস্থিতিতে চলাফেরার অসুবিধা সত্ত্বেও উপস্থিত হয়ে জোরালো কণ্ঠে গেয়ে উঠেছেন 'এসো হে গৃহদেবতা।' এইরকম কর্মব্যস্ততার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করেছেন।

পাঠভবন বিদ্যালয়ের ছাত্র শান্তিদা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হয়েও গুরুদেবের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে এসে নাচ, গান, অভিনয় ও আবৃত্তিতে দিক্‌পাল হয়েও ক্ষান্ত হন নি ; এর মাঝে গুরুদেবের প্রেরণায় বিভিন্ন গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা গভীর মনোযোগ সহকারে পড়াশুনা করে জ্ঞানপিপাসু মনকে পরিপূর্ণভাবে তৈরি করে নিয়েছিলেন। বেশ কিছু ছাত্র-ছাত্রী তাঁর কাছে গুরুদেবের নানা বিষয় নিয়ে গবেষণাও করেছেন। যতদূর জানি ও শুনেছি তাতে বলা যায় রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ক সবচেয়ে প্রথম গ্রন্থ শান্তিদার লেখা "রবীন্দ্রসংগীত"। এছাড়াও সংগীত ও নৃত্যের উপর তাঁর নানা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

সংগীতভবনে ছাত্র থাকাকালীন ১৯৭১ সালে আমি ছোটো একটি GRUNDIG tape-recorder পাই। হাসি বৌদির নির্দেশে শান্তিদার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের গান ওতে রেকর্ডিং করে এনে বৌদিকে দিতাম। পরে বৌদির নিজস্ব টেপ রেকর্ডারে রেকর্ডিং করে আনা হত। এর জন্য শান্তিদার কাছে অনেক কথাও শুনতে হয়েছে, বিরক্তও হয়েছেন। অনুষ্ঠান শুরুর আগে মাইক্রোফোন ঠিক করতে গেলেই বলতেন, এ-সব আবার কী করছ। বলতাম আপনি বসুন, সব ঠিক করে দিচ্ছি। বিরক্ত হলেও বাড়িতে এসে বৌদি যখন বাজাতেন তখন আবার শুনে খুশি হতেন। এইভাবে বহু বছর ধরে সমস্ত অনুষ্ঠানে কী কী গান কোথায় গেয়েছেন সবই বৌদি বিশেষ যত্নসহকারে ক্যাসেটে সংরক্ষিত করে রেখে দিয়েছেন, যা অতি মূল্যবান। গানগুলি শুনলে মনে হয় শান্তিদার পাশে বসেই যেন শুনছি।

গুরুদেবের হাতে শান্তিদাকে লেখা শেষ চিঠি অনেকেই পড়েছেন বা দেখেছেন। সারাজীবন শান্তিদা সেই উপদেশ প্রকৃত শিষ্যের মতো অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেছেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত গুরুদেবের গানকে বিশুদ্ধভাবে প্রচার করে গেছেন অক্লান্তভাবে। অর্থলোভেও কোনোদিন আশ্রম ছেড়ে চলে যান নি। তিনি বলতেন আমি একজন অতি সাধারণ মানুষ। সে যুগে বিখ্যাত, নামি-দামি বহু ব্যক্তি অনেকেই এসেছেন, থেকেছেন, কেউ চলেও গেছেন ; গুরুদেব কিন্তু কাউকেই এই ধরনের চিঠি দিয়ে যান নি ; আমাকে তিনি কেন দিলেন। বলতেন সম্মান উপাধি অনেক পেলেও জীবনের সবচেয়ে বড়ো সার্টিফিকেট এই চিঠিটা। সংবর্ধনা সভায় প্রায়ই বলতেন, আমি কিছুই নই, সবই গুরুদেবের আশীর্বাদ। তাঁকে স্মরণ করে

'ওই আসনতলের মাটির পরে', ও 'আমার মাথা নত করে' গান দুটি প্রায় সব জায়গায় গাইতেন। এ যেন সেই নিরহংকার, আত্মভোলা, সদাহাস্যময় মানুষটির মনের গভীরের কথা। শেষের দিকে কয়েক বছর অনুষ্ঠানের জন্য গান বেছে দিতে বলতেন এবং সেগুলি পৃথক পৃথক কাগজে বড়ো বড়ো অক্ষরে পর পর যেভাবে হবে সেইভাবে লিখে দিতে বলতেন।

শান্তিদার সঙ্গে আমার গুরু-শিষ্য সম্পর্ক থাকলেও ধীরে ধীরে তাঁর সঙ্গে ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে উত্তরোত্তর আরো ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠেছিলাম। পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। এইভাবে প্রায় তিরিশ বছর তাঁর ঘনিষ্ঠ সঙ্গী হওয়ার সুযোগ পেয়েছি শান্তিনিকেতনে। এখানে ও বাইরে সমস্ত অনুষ্ঠানে তাঁর সঙ্গী হয়ে বাজিয়েছি ও গান গেয়েছি। হাসি বৌদি বাড়িতে শান্তিদা, পরিবারের লোকজন, আত্মীয়-স্বজন ও আমাদের যেমন যত্নসহকারে নিষ্ঠার সঙ্গে হাসিমুখে সব-কিছু আগলেছেন, তেমনিভাবে শান্তিদার সব অনুষ্ঠানে সঙ্গী হয়ে উপস্থিত থেকেছেন।

বছরের পর বছর ৭ই পৌষ, বসন্তোৎসব, ১লা বৈশাখ, ২২শে শ্রাবণ, বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান হবে ; পৌষ মেলায় বাউল, কীর্তনিয়া ও লোকসংস্কৃতির শিল্পীরা জড়ো হবেন, আসরে কেঁদুলির জয়দেব মেলা, সিউড়ীর হুল উৎসব, পাথরচাপড়ি ও কুষ্টিকুরির মুসলিম ফকিরদের মেলা, বৈরাগীতলার মেলা সবই যথারীতি চলবে, তবে লোকসংস্কৃতির প্রাণপুরুষ ও মধ্যমণি শান্তিদাকে সেখানে কোনোদিন আর দেখা যাবে না। তাঁর আসন থাকবে শূন্য। রবীন্দ্রসংগীতের অনন্যসাধারণ শিল্পীর বলিষ্ঠ কণ্ঠের প্রথম গান এই-সব অনুষ্ঠানে আর কোনোদিন শোনা যাবে না।

১৯৯৮ সালের ৫ ডিসেম্বর এস. এস. কে. এম. হাসপাতালে ভর্তি হয়ে সুস্থ হওয়ার পর ফিরে এলেন। ১৯৯৯ সালের ২৬ নভেম্বর রাজ্য সরকারের ব্যবস্থাপনায় সকলের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলে সন্ধ্যার ট্রেনে শান্তিদাকে নিয়ে যাওয়া হল এস. এস. কে. এম. হাসপাতালে, সঙ্গে হাসি বৌদি ও আমি পূর্বের মতো এবারও গেলাম। ১ ডিসেম্বর রাত ১১টায় দার্জিলিং মেলের একটি বিশেষ এ.সি. কোচে রাজ্য সরকারের সহায়তায় বোলপুর স্টেশনে শান্তিদা ফিরলেন ঠিকই কিন্তু তাঁর নিশ্চল, নিথর, নির্বাক দেহ নিয়ে যে তাঁর শান্তিনীড়ে ফিরতে হবে তা স্বপ্নেও ভাবি নি। যেখানেই যেতেন তবুও যেন সেই পিছুটান, সেই গুরুদেব, সেই শান্তিনিকেতন, সেই আশ্রম। পরিচিত আরামের সেই তক্তাপোষে যেন পরম শান্তিতে ঘুমোচ্ছেন, চিরশান্তির দেশে পাড়ি দেওয়ার জন্য। সেদিন ছিল না কোনো চিৎকার-চেঁচামেচি, বকাবকি, রাগ, দ্বন্দ্ব, ঝগড়া বা মেজাজ। ১৯১০ সালের ছ' মাস বয়স থেকে উননব্বই বছরের দীর্ঘ আশ্রমজীবন কয়েকদিনের ব্যবধানে সব যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

সংগীত শিক্ষক শান্তিদা

অশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়

১৯৬৫ সালে আমি যখন সংগীতভবনের ছাত্র হয়ে আসি, সে সময়ে শান্তিদা ছিলেন সংগীতভবনের অধ্যক্ষ। তখন বি. মিউজ., এম্. মিউজ. কোর্স ছিল না। শুধু ছিল চার বছরের ডিপ্লোমা কোর্স। আমরা ডিপ্লোমা প্রথম বর্ষে ভর্তি হলাম। ক্লাসের সময়সারণী দেখতে সংগীতভবন দপ্তরে গিয়েছি। দেখলাম সপ্তাহে ছদিন রবীন্দ্রসংগীতের ক্লাস নেবেন শান্তিদা। তখন থেকেই শান্তিদার কাছে গান শেখা শুরু হল। ডিপ্লোমার চার বছরই শান্তিদাকে পেয়েছি। ইতিমধ্যে বি. মিউজ. খুলেছে। বি. মিউজের দু-বছর শান্তিদার কাছে গীতিনাট্য নৃত্যনাট্য শিখেছি। পরবর্তীকালে পি-এইচ্.ডি.-র গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে তাঁকে দশ বছর পেয়েছি। এইভাবে প্রায় একটানা বহুবছর শান্তিদাকে শিক্ষক হিসেবে পাবার সৌভাগ্য হয়েছে। ক্লাসের ভিতরে ও বাইরে শান্তিদাকে যতরকমভাবে পেয়েছি তার সবটা বলতে গেলে একখানা বই হয়ে যাবে। কোন্‌টা বলব আর কোন্‌টা বলব না তা নির্বাচন করা খুবই কঠিন।

শান্তিদার সঙ্গে যখন আমার প্রথম দেখা হল তখন শান্তিদাকে 'স্যার' সম্বোধন করে কথা বলছিলাম। বাইরে থেকে এসেছি, মাস্টারমশাইদের স্যার বলাই অভ্যাস ছিল। শান্তিদা সঙ্গে সঙ্গে আমাকে শুধরে দিয়ে বললেন— আমার নাম শান্তিদেব ঘোষ, আমাকে শান্তিদা বলেই ডেকো। প্রথম প্রথম পিতার সমবয়সী ব্যক্তিকে 'দাদা' বলে ডাকতে অসুবিধে হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু ক্রমশ সেই অসুবিধেটা কাটিয়ে উঠেছিলাম। তখন আমরা উপাচার্যমশাই থেকে শুরু করে সাধারণ কর্মী অধ্যাপক সকলকেই দাদা বলে ডাকতাম। যুগ পাল্টেছে। এখন দেখছি স্যার সম্বোধন ক্রমশ প্রবল হচ্ছে। শান্তিদাকে খালি পায়েও ক্লাসে আসতে দেখেছি। এখন শান্তিনিকেতনে খালি পায়ে হাঁটার রীতিটিও অপ্রচলিত হয়ে গেছে।

শান্তিদার ক্লাসে গান শেখাবার পদ্ধতি ছিল একটু আলাদা। ধরা যাক গানের স্থায়ী অংশ। এই অংশটিকে আপন আবেগে বহুবার গেয়ে যেতেন। আমরা চুপ করে শুনে যেতাম। নিজেরা যখন বুঝতাম এবার এই অংশটি আমরাও গাইতে পারব তখনই গলা দিতাম। এর পর আমরাই বহুবার ওই অংশটিকে গেয়ে গেয়ে অভ্যাস

করে ফেলতাম। শান্তিদা তখন চুপ করে থাকতেন। এইভাবে গানের একটি অংশ পরিপূর্ণ আয়ত্ত করে ফেলার পর পরবর্তী অংশ ধরতেন। এভাবেই চলত শান্তিদার কাছে আমাদের গানের শিক্ষা। শান্তিদা বলতেন যে, শুধুমাত্র সুরটি গলায় তুললে হবে না। সুর কথা তাল ছন্দ লয় সব-কিছু মিলিয়ে গানের সামগ্রিক রূপটিকে ধরতে হবে। সপ্তাহে একদিন তাল সংগতের সঙ্গে গান অভ্যাস করতে হত। আমরা তালযন্ত্রের সঙ্গে ক্লাসে শেখা গানগুলি পর পর গেয়ে যেতাম। সংগতের দিনে শান্তিদা তো নতুন গান শেখাতেন না, হয় তিনি হার্মোনিয়ামে সা পা টিপতেন কিংবা এস্রাজ বাজাতেন। তানপুরা থাকত আমাদেরই হাতে। পরবর্তীকালে আমরা নৃত্যনাট্যেরও গান শিখেছি এইভাবে। গানের ভাব অনুযায়ী কোনো গান তিনি গাইতেন অত্যন্ত মোলায়েমভাবে কখনো বা জোরালো কণ্ঠে তালের মাত্রায় মাত্রায় ঝোঁক দিয়ে। এভাবে আমরা শ্যামা, চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা প্রভৃতি নৃত্যনাট্যের গান শিখেছি।

শান্তিদা বলতেন যে আমরা কেউই গুরুদেবের গানকে সামগ্রিকভাবে বিচার করতে পারি না। যাঁরা করি তাঁরা গুরুদেবের গানের বাণী ও বিষয়বস্তুর দিকেই নজর দেন। যাঁরা উচ্চাঙ্গ সংগীতের শিল্পী তাঁরা গুরুদেবের ব্যবহৃত রাগ রাগিণীর বৈচিত্র্যের দিকে আকৃষ্ট হন। আবার যাঁরা তাল যন্ত্রের শিল্পী তাঁদের আকৃষ্ট করে গুরুদেবের গানে ব্যবহৃত তাল ছন্দের বৈচিত্র্য। কিন্তু সুর তাল লয় ছন্দ বাণী সব মিলিয়ে গুরুদেবের গানের সামগ্রিক রূপটি আমরা বুঝতে পারি না। আমরা গুরুদেবের গানকে দেখি অন্ধের হস্তিদর্শনের মতো। শান্তিদা বলতেন যে, রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গানই মধ্যলয়ে গাইবার উপযোগী। কোনো কোনো গান দ্রুতলয়ে গাইলে ভালো, খুব বিলম্বিত লয়ের গান প্রায় নেই বললেই হয়। তিনি বলতেন হাহাকার করার মতো কিংবা লুটিয়ে কান্নাকাটি করার মতো গান গুরুদেব রচনা করেন নি। দু-একটি গানের উদাহরণ শান্তিদার কাছে অনেকবারই শুনেছি। তার মধ্যে মনে পড়ছে "আছে দুঃখ আছে মৃত্যু" গানটি। শিল্পীরা গানটির প্রথম পংক্তি "আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহ দহন লাগে" এইটুকু বুঝে নিয়েই অত্যন্ত বিলম্বিত লয়ে কাতর কণ্ঠে গানটি গাইতে শুরু করেন, কিন্তু পরের পঙ্‌ক্তিতেই আছে "তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে"— এই বক্তব্যের প্রতি তাঁদের নজর থাকে না। আর-একটি গান "তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে"। এটি মৃত্যুর গান বলেই আমরা জানি, কাজেই শিল্পীরা বিলম্বিত লয়ে দুঃখে কাতর হয়ে গানটি গেয়ে থাকেন। কিন্তু গানটির দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে আছে "কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথা বিচ্ছেদ নাই"— এই পঙ্‌ক্তিটির কথা সকলে ভুলে যান। শান্তিদার বক্তব্য হল গানগুলির সামগ্রিক বিষয়বস্তুর কথা চিন্তা করে মধ্যলয়েই গানগুলি গাওয়া উচিত।

কেন জানি না গানের ব্যাপারে শান্তিদাকে কেউ কেউ গোঁড়া বলে মনে করতেন।

কিন্তু গানের ব্যাপারে তিনি ছিলেন সত্যিকারের উদারপন্থী। আমি তখন রেডিয়োতে নিয়মিতভাবে গান করি। একবার রেকর্ডিং-এর আগে মহড়ার সময় তবলিয়া সাধারণ ঠেকা দিতে লাগলেন। আমি বললাম— আপনার মতো একজন উঁচুদরের তবলিয়াকে পেয়েছি, আপনি খেলিয়ে বাজান। তিনি বললেন— ওরেব্বাবা, আপনি বিশ্বভারতী থেকে এসেছেন, বিশ্বভারতীতে শান্তিদেব ঘোষ রয়েছেন, তিনি তো আমাকে মেরে ফেলবেন। আমি তাঁকে অনেকভাবে বুঝিয়ে বলাতে শান্তিদা সম্পর্কে তাঁর ভুল ধারণাটা চলে গেল। রেকর্ডিং-এর সময় উনি খুব সুন্দর করে নানারকম ছন্দবৈচিত্র্য সহযোগে বাজালেন। শান্তিদা সেই গান শুনে প্রশংসাও করেছিলেন। শান্তিদা আমার প্রায় প্রতিটি রেডিয়োর অনুষ্ঠান শুনেছেন। অনেকসময় আমি শান্তিদার বাড়িতে গিয়েছি এবং একসঙ্গে বসে আমার গান শুনেছি। যে গান ওনার ভালো লাগত সেই গান শুনে বলতেন— বেশ গেয়েছো। আবার কোনো গানের ক্ষেত্রে তিনি বলতেন এ গানটি আরো একটু দ্রুত লয়ে গাইলে ভালো হত। অথবা— এই গানটির কথাগুলি ছন্দের ঝোঁকে ঝোঁকে উচ্চারণ করলে ভালো লাগত। যে কথাটি বলতে যাচ্ছিলাম —গানের ব্যাপারে তাঁর উদারপন্থী মনোভাব। একটি উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। শান্তিদার কাছে ক্লাসে যখন গান শিখতাম তখন বরাবরই স্বরলিপি দেখে শান্তিদা গান শেখাতেন। অনেক সময় কোনো কোনো গানের কোনো কোনো অংশ স্বরলিপি অনুযায়ী আমাদের কণ্ঠে তুলতে পারতাম না। শান্তিদা যখন দেখতেন বার বার চেষ্টা করা সত্ত্বেও স্বরলিপির সুরটি আমাদের কণ্ঠে উঠছে না, তখন সহজভাবে যে সুরটি আমাদের কণ্ঠে উঠে আসত সেটিকেই তিনি অনুমোদন করে দিতেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আর-একটি কাজ করতেন। যে সুরটি আমরা গাইলাম সেই সুরগুলি স্বরলিপি বইয়ে লিখে দিতেন এবং নিজের নামটি স্বাক্ষর করে দিতেন। এই দায়িত্ব এবং অধিকার শান্তিদেব ঘোষেরই ছিল। এখনো সংগীতভবন গ্রন্থাগার খুঁজলে এইরকম কয়েকটি গানের খোঁজ মিললেও মিলতে পারে।

শান্তিদাকে আমার পি-এইচ.ডি.-র গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে একটানা দশ বছর পেয়েছি। তিনি ছিলেন একজন খুব কড়া ধরনের তত্ত্বাবধায়ক। ধরা যাক দিনরাত্রি খেটে অনেক বইপত্র ঘেঁটে গবেষণার কোনো অংশ শান্তিদাকে দেখাতে গিয়েছি। শান্তিদা আমাকে পাশে বসিয়ে পুরো অংশটি পড়তেন। পড়তে পড়তে বিভিন্ন জায়গায় নানারকম চিহ্ন এঁকে দিতেন। অংশটি পড়া যখন শেষ হত তখন শান্তিদা একে একে আমাকে নানারকম প্রশ্ন করতেন। যে জায়গাগুলোর উত্তর আমি সন্তোষজনকভাবে দিতে পারতাম সেই জায়গাগুলোতে তিনি তাঁর নামটি স্বাক্ষর করে দিতেন। আর যে জায়গাগুলিতে সেটি না পারতাম সেই জায়গাগুলো তিনি কলমের খোঁচায় কেটে দিতেন এবং বলতেন— আবার লেখো। কিন্তু কখনোই তিনি আমাকে

নিজে লিখিয়ে দিতেন না। একবার একজনের লেখায় শান্তিদার একটি উদ্ধৃতি পেয়েছিলাম। উদ্ধৃতিটির Reference হিসেবে লেখক একটি প্রবন্ধের নাম করেছিলেন। আমি ঐ প্রবন্ধটি পড়বার ইচ্ছায় শান্তিদার কাছে জানতে চেয়েছিলাম কোনো্ বই-এ এই প্রবন্ধটি প্রকাশ পেয়েছে। শান্তিদা আমাকে বললেন— সেটাতো আমি তোমাকে বলব না। তুমি গবেষক, তুমি খুঁজে বার করে নাও। বিশ্বভারতীর নানা গ্রন্থাগার ঘেঁটেঘুঁটে অবশেষে কলাভবনের গ্রন্থাগারে কোনো একটি 'দেশ' বিনোদন সংখ্যায় ঐ প্রবন্ধটির খোঁজ পাই। শান্তিদা কিন্তু নিজে আমাকে সেই খোঁজটি দেন নি। তাই বলছিলাম— শান্তিদা ছিলেন খুব কড়া ধরনের তত্ত্বাবধায়ক।

শান্তিদার কাছে শুধু গানই শিখি নি, অভিনয়ও শিখেছি। রবীন্দ্রনাথের 'বশীকরণ', 'শোধবোধ', 'গৃহপ্রবেশ', এই নাটকগুলিতে শান্তিদার পরিচালনাধীনে অভিনয় করেছি। একটি চরিত্র কিভাবে এগিয়ে ক্রমশ পরিণতি পায় সেটি শান্তিদা খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে দিতেন। কখনো কোনো অভিব্যক্তি শান্তিদার পছন্দ না হলে তিনি বার বার বোঝাতেন কিরকম হওয়া উচিত। কিন্তু নিজে অভিনয় করে বড়ো একটা দেখিয়ে দিতেন না। একবার 'বশীকরণ' নাটকের মহড়ার সময় শান্তিদা বেশ কিছুদিনের জন্য শান্তিনিকেতনের বাইরে গিয়েছিলেন। আমাকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন নাটকের মহড়া চালিয়ে যাবার জন্য। আমি নিজে 'অন্নদার' চরিত্রটিকে নিজের মতো রূপ দেবার চেষ্টা তো করেছিলামই, উপরন্তু অন্যান্য চরিত্রের অংশগ্রহণকারীদেরও আমি আমার মতো তৈরি করে দেবার চেষ্টা করেছিলাম। বেশ কিছুদিন পর শান্তিদা ফিরে এসে আমাদের মহড়াটি দেখতে চাইলেন। আমার তো তখন প্রচণ্ড ভয়, মহড়া দেখে শান্তিদা আমাকে কী পরিমাণ বকুনি দেবেন মনে মনে তা পরিমাপ করছি। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে উতরে গিয়েছিলাম। খুব ছোটো ছোটো পরিবর্তন ছাড়া তিনি আর কিছুই করলেন না, যেমনভাবে আমরা তৈরি হয়েছিলাম তেমনভাবেই রেখে দিলেন। একবার 'গৃহপ্রবেশ' নাটকে যতীনের চরিত্রে অভিনয় করছি। যাঁরা নাটকটি পড়েছেন তাঁরা জানেন যে যতীনের শারীরিক অবস্থা ক্রমশই খারাপ হয়ে আসবে। প্রত্যেক দৃশ্যেই যতীনকে রোগশয্যায় শোওয়া অবস্থায় দেখানো হয়। শান্তিনিকেতনে তো ড্রপসিনের প্রচলন নেই। এখানে দৃশ্য পরিবর্তনের সময় মঞ্চের আলোগুলিকে কমিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তাতে অস্ফুট আলোকে মঞ্চটিকে মোটামুটি পরিষ্কারভাবেই দেখা যায়। যখন অভিনয় হবে তখন যতীনরূপী আমাকে শয্যাশায়ী দেখানো হবে, আর দৃশ্য পরিবর্তনের সময় দর্শকেরা আমাকে খাট থেকে নেমে মঞ্চের বাইরে চলে যেতে দেখবেন— এটা আমি চাই নি। কারণ আমার মনে হয়েছিল তাতে নাটকের রসভঙ্গ হবে। শান্তিদাকে আমি পরামর্শ দিলাম নাটকের দৃশ্য পরিবর্তনের সময় যদি মঞ্চের দুই কোণে রাখা দুটি ফ্লাড লাইটের জোরালো আলো দর্শকদের দিকে মুখ

করে জ্বালানো হয় তবেই দর্শকেরা আমাকে খাট থেকে নেমে মঞ্চের বাইরে চলে যেতে দেখতে পারবেন না। শান্তিদা আমার পরামর্শ মতোই কাজ করলেন। নাটকের অভিনয়ের পর সকলেই নাটকের প্রশংসা করেছিলেন। কেউ কেউ এমনও বলেছিলেন যে তাঁরা চোখের জল ধরে রাখতে পারেন নি। কিন্তু সকলেরই একই প্রশ্ন ছিল দৃশ্য পরিবর্তনের সময় ফ্লাড লাইটের আলোতে দর্শকদের চোখ ধাঁধিয়ে বিরক্তি উৎপাদন করার কি প্রয়োজন ছিল। এমনটি তো আগে কখনো হয় নি। সকলেই ভেবেছেন এটি শান্তিদার পরিকল্পনা। কিন্তু দর্শকদের চোখ ধাঁধিয়ে দেবার পিছনে শান্তিদার কোনো হাত ছিল না একথা আজ স্বীকার করি। শান্তিদার সপ্ততিতম জন্মদিনে শান্তিদাকে নিয়ে তাঁরই পরিচালনায় তাঁর আপনজনেরা 'তাসের দেশ' নাটকের অভিনয় করেন শান্তিনিকেতনে। এই দল পরে কলকাতার রবীন্দ্রসদন মঞ্চেও এই নাটকের অভিনয় করে। নাটকে শান্তিদা করেছিলেন রাজপুত্রের অভিনয়। রাজপুত্রের নাচ শান্তিদার ঐ বৃদ্ধ বয়সের দেহছন্দের সুষমায় এক অসাধারণ রূপ পেয়েছিল। নাচ বলতে যা বুঝি এ নাচ ঠিক সেরকম নয়। এ যেন সাধারণ অঙ্গভঙ্গি ও নাচের ভঙ্গির এক সুন্দর বোঝাপড়া। যেন সাধারণ ভঙ্গিগুলিকে নাচের লালিত্যে প্রকাশ করা, তার সঙ্গে মিশে ছিল কিছু পায়ের ছন্দ। ঐ নাটকে আমি ছিলাম গানের দলে। শান্তিদার হাতে পড়ে নাটকের বিভিন্ন চরিত্র কেমনভাবে গড়ে ওঠে, গানগুলি কিভাবে তৈরি হয়, 'তাসের দেশ' নাটকটি সামগ্রিকভাবে কী রূপটি পায় তা অত্যন্ত কাছ থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছি। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে 'তাসের দেশ' নাটকে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করতে অথবা ছাত্র-ছাত্রীদের বিচিত্ররীতির গানগুলি শিখিয়ে দিতে আমার কোনো অসুবিধা হয় নি।

শান্তিদার কাছে রবীন্দ্রনাথের গান ছিল অত্যন্ত শ্রদ্ধার বস্তু। রবীন্দ্রনাথের গান শান্তিদার প্রাণের স্পন্দন। যতদিন শান্তিদা সমর্থ ছিলেন ততদিন দেখেছি তাঁকে নিয়মিতভাবে গানের রেওয়াজ করতে। প্রথমে আ-কার দিয়ে বলে সুর অভ্যাস করতেন। তার পর সপাট তানের মতো অভ্যাস করতেন। তার পর ধরতেন রবীন্দ্রনাথের গান। একেকটি গান তিনি অনেকবার করে আপন আবেগে গেয়ে যেতেন। বেশ কয়েকটি গান এভাবে গাইতেন, তবে শেষ হত তাঁর রেওয়াজ। যাঁরা শান্তিদার গান শুনেছেন তাঁরা জানেন বাউলাঙ্গ-কীর্তনাঙ্গ গানে এবং নাটক-গীতিনাট্য-নৃত্যনাট্যের গানে শান্তিদা ছিলেন অনন্য। তাঁর কণ্ঠে পড়ে গানগুলি যেন মূর্ত হয়ে উঠত, গানগুলিকে যেন আমরা ভিসুয়ালাইজ করতে পারতাম। এবং গানগুলোর অর্থ আমাদের মর্মে গিয়ে আপনা-আপনিই প্রকাশ পেত। রেকর্ড বা রেডিয়োতে শান্তিদার গান শুনলে তাঁকে ঠিকভাবে বোঝা যাবে না। শান্তিদার অনন্যতা যে কোন্ জায়গায় সেটিকে বুঝতে হলে তাঁর লাইভ প্রোগ্রাম শোনা দরকার। তাঁর

গানের নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। সব থেকে বড়ো জিনিস যা আমার মনে লেগেছে তা হল পুরুষালী দৃপ্ত ভঙ্গিমা, গানের কথাগুলিকে না টেনে ছোটো ছোটো করে উচ্চারণ করা, ছন্দের মজাটিকে উপলব্ধি করে গান করা আর প্রয়োজনমতো সমের জায়গায় সামান্য একটু ঝোঁক দেওয়া। অনুষ্ঠানে গান গাইবার সময় শান্তিদা একটি কাজ করতেন। একটি গান পুরোপুরিভাবে শেষ করে স্থায়ী অংশে ফিরে আসতেন। এসে ঐ অংশটিকে বার বার গাইতেন। ঐ সময় তিনি তালযন্ত্র শিল্পীকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতেন। শান্তিদা বার বার স্থায়ী অংশটি গেয়ে যেতেন এবং তালযন্ত্রী বিভিন্ন ছন্দোবৈচিত্র্য সহযোগে খেলিয়ে বাজাতে থাকতেন। এইভাবে বেশ কয়েকবার করার পর গান থামত। এই প্রক্রিয়ায় গানগুলি যে কতখানি প্রাণবান আর আকর্ষণীয় হয়ে উঠত তা যাঁরা না শুনেছেন তাঁরা বুঝবেন না। রবীন্দ্রনাথের গান নাচ আর নাটক এই তিনটি শিল্পের সমন্বয়ে শান্তিদার জীবন পুষ্ট হয়েছে, গড়ে তুলেছে শান্তিদার সামগ্রিক শিল্পীসত্তাকে। কিন্তু তবুও শান্তিদার সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমার মনে হয়েছে রবীন্দ্রনাথের গানই ছিল তাঁর সুখদুঃখের সময়ে সবচেয়ে কাছের সঙ্গী।

শান্তিদাকে দেখেছি দৈনন্দিন জীবনের কোনো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে উঠতে কিংবা আবৃত্তি করতে। দুটি ঘটনা বলি। আমার বড়ো ছেলের তখন শিশু বয়স। সে শান্তিদার কাছে গিয়ে মুখ দিয়ে অস্ফুট স্বরে নানারকম আওয়াজ করছিল। সে তখনো কথা বলতে পারে না। কিছুক্ষণ পরে শান্তিদা গেয়ে উঠলেন— "অনেক কথা যাও যে বলে কোনো কথা না বলি, তোমার ভাষা বোঝার আশা দিয়েছি জলাঞ্জলি"। গানটি গেয়ে উঠেই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন— গানটি গুরুদেব কখন রচনা করেছেন জান? আমি তো জানতাম না। শান্তিদা বললেন যে রথীন্দ্রনাথের কন্যা নন্দিনীদেবীর যখন শিশু বয়স, তখন তিনি মাঝে মাঝেই গুরুদেবের কাছে গিয়ে অস্ফুট স্বরে নানারকম কথা বলতেন। কিন্তু গুরুদেব তার ভাষাটি বুঝতে পারতেন না। এই কথা মনে রেখেই গুরুদেব গানটি রচনা করেছিলেন। আর-একটা ঘটনা বলি। আমার ছোটো ছেলের বয়স তখন মাত্র এগারো বছর। পঁচিশে বৈশাখের মন্দিরের উপাসনায় শান্তিদা রবীন্দ্রনাথের বাউলাঙ্গ গান সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য রেখেছিলেন। তাতে শান্তিদার অনেকগুলি গান ছিল। পাঠভবনের ছেলে-মেয়েরাও কয়েকটি গান গেয়েছিল এবং আমার ছোটো ছেলেকে দিয়ে শান্তিদা গাইয়েছিলেন "বনে যদি ফুটল কুসুম" গানটি। অনুষ্ঠানের শেষে আমি শান্তিদার সঙ্গে দেখা না করে মন্দিরের বাইরে বেরিয়ে গিয়েছি ভীষণ ভয় পেয়ে। কী জানি ছেলের গান শান্তিদার পছন্দ হল কি না। আমার স্ত্রী মন্দিরের ভিতরে শান্তিদার কাছে গেলে তিনি তাকে বললেন— কি হে, তোমার ছেলে তো আজ মাতিয়ে দিয়েছে। তার পর জিজ্ঞেস করলেন ওর বাবা কোথায়? স্ত্রী বললেন যে

উনি মন্দিরের বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। শান্তিদা মুচকি হেসে বললেন— 'সে কেবল পালিয়ে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায়'।

আমার সঙ্গে শান্তিদার যখন প্রথম দেখা হয় আমার তখন আঠেরো বছর বয়স। শান্তিদার কাছে আমি বোধ হয় আমার আঠেরো বছরের কৈশোরটাকে কাটিয়ে উঠতে পারি নি কখনোই। শান্তিদা আমাকে কি ভাবতেন জানি না। তিনি আমাকে কখনোই গান বাজনা পড়াশুনো করা ছাড়া কোনো রকম কাজ করার দায়িত্ব দেন নি। শান্তিদার বাড়িতে নানান উপলক্ষে নানান অনুষ্ঠান হতে দেখেছি। কর্মযজ্ঞে অনেককেই নানা কাজের দায়িত্ব পালন করতে দেখেছি। সেই উপলক্ষে আমিও পরিবারসহ নিমন্ত্রিত হয়েছি। কিন্তু শান্তিদা কখনোই আমাকে কোনো কাজের দায়িত্ব দেন নি। অথচ শান্তিদার কোনো কাজ করে দিতে পারলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করতাম। শান্তিদার সঙ্গে নানা অনুষ্ঠানে কলকাতায় তো বহুবার গিয়েছিই, অন্যান্য অনেক জায়গায় যাবারও সুযোগ পেয়েছি। ট্রেনের টিকিট কেনা, গাড়ির ব্যবস্থা করা ও অন্যান্য নানা কাজের দায়িত্ব শান্তিদা নানা জনকে দিতেন কিন্তু আমাকে কোনো দায়িত্ব দিতেন না। এমনকি পথে ঘাটে শান্তিদার স্যুটকেশ যখন আমি হাতে তুলে নিতাম তখনো শান্তিদা বলতেন— তুমি ছাড়ো তুমি পারবে না, তুমি তোমারটা নাও। একবার আমি উচ্চরক্তচাপ ও স্পনডেলাইটিসে কষ্ট পাচ্ছিলাম। সে সময় আমার ছোটো ছেলে শান্তিদার সঙ্গে কোনো কারণে দেখা করতে গিয়েছিল। বাড়ি ফিরে এসে সে হাসতে হাসতে বলল,— গানদাদু তোমাকে কী বললেন জান? তুমি নাকি বাচ্চা ছেলে। গানদাদু তোমার অবস্থার কথা শুনে বললেন— ছেলেটা এমন বাচ্চা বয়েসেই এত ভুগছে, বড়ো হলে কী করবে। সে সময় আমার বয়স পঞ্চাশ বছর পার হয়েছে। কাজেই বলছিলাম যে আমার কেবলই মনে হয় শান্তিদা বোধ হয় বরাবর আমাকে বাচ্চা ছেলে ভেবেই এসেছেন।

শান্তিদা তখন খুবই অসুস্থ। তাঁকে শেষবারের মতো শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হবে চিকিৎসার জন্য। সেদিন সন্ধে হয় হয়। শান্তিদা নিজের খাটটিতে শুয়ে আছেন। বাড়িতে লোকের ভীড়। সকলেই কর্মব্যস্ত। আমারো মন খুব খারাপ। কী করব ভেবে উঠতে না পেরে ঘর-বার করছি। কিছুক্ষণ পর শান্তিদা আমাকে ডেকে বললেন— এই অশোক, তুমি এখানে বোসো। এই বলে তাঁর পাশটিকে দেখিয়ে দিলেন। আমি তাঁর পাশে গিয়ে বসলাম। শান্তিদা আমাকে খুব ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলেন— আমাকে কোন্ ট্রেনে নিয়ে যাওয়া হবে? আমি বললাম —সন্ধ্যার ট্রেনে। শান্তিদা জিজ্ঞাসা করলেন— আমাকে পি. জি. হাসপাতালেই নিয়ে যাওয়া হবে তো? আমি উত্তর দিলাম— হ্যাঁ। শান্তিদা আরো বললেন— আমাকে কিভাবে যে ওরা নিয়ে যাবে আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আমি তখন বলেছিলাম

—আপনি এ-সব বিষয়ে কিচ্ছু চিন্তা করবেন না, যারা আপনাকে নিয়ে যাবে তারা উপযুক্ত ব্যবস্থা করেই নিয়ে যাবে। এরকম দু-একটি ছোটো খাটো কথা বলতে বলতেই শান্তিদাকে বোলপুর স্টেশনে নিয়ে যাবার জন্যে গাড়ি এল। ধীরে ধীরে শান্তিদাকে আমরা অনেকে মিলে গাড়িতে তুলে দিলাম। গাড়ি চলে গেল। শান্তিনিকেতনে বসে প্রায় প্রতিদিনই খবর পাচ্ছিলাম শান্তিদার অবস্থা ক্রমশ খারাপ হয়ে আসছে। ইচ্ছে ছিল কলকাতায় গিয়ে শান্তিদাকে দেখে আসব। কিন্তু যাব যাব করেও যাওয়া হয়ে ওঠে নি। এই আক্ষেপ আমার থেকে গেল। কয়েকদিন বাদে শান্তিদার নিথর দেহ শান্তিনিকেতনে ফিরে এল।

শান্তিদা সম্পর্কে অনেক কথা বলা বাকি রয়ে গেল। সময় সুযোগ পেলে পরে বলব। শান্তিদাকে প্রণাম জানিয়ে এবং তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করে লেখাটি শেষ করছি।

রবীন্দ্রব্রতী শান্তিদেব

গৌতম ভট্টাচার্য

শান্তিনিকেতনে উৎসব অনুষ্ঠানের একটি ধারাপরম্পরা আছে দীর্ঘকালের। বাংলা বছর ধরলে নববর্ষ ও হলোৎসব দিয়ে তার শুরু, আর শেষ বর্ষশেষে এর মধ্যে আছে বৃক্ষরোপণ উৎসব, রবীন্দ্র সপ্তাহ, হলকর্ষণ, স্বাধীনতা দিবস, শিল্পোৎসব, মহর্ষি স্মরণ, মাঘোৎসব, খৃস্টোৎসব ইত্যাদি। এছাড়া যে-সব অনুষ্ঠানে প্রচুর জনসমাবেশ হয় তা হল পৌষ-উৎসব ও বসন্তোৎসব। হয়তো কোনোও বিশ্ববিদ্যালয়েই পঠন-পাঠনের সঙ্গে সারা বছর এত উৎসব অনুষ্ঠানের প্রচলন নেই। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়কে সাধারণ মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন করে জ্ঞানচর্চার দ্বীপকেন্দ্র করতে চান নি এর প্রতিষ্ঠাতা আচার্য, তাই বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে এক সজীব সংযোগ। এই ধারায় দীর্ঘকাল যাঁর ভূমিকা ছিল অনিবার্য ও অপরিহার্য তিনি শান্তিদেব ঘোষ। বিগত কুড়ি-বাইশ বছর এই উৎসব অনুষ্ঠানের সূত্র ধরেই শান্তিদার সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ আমার হয়েছিল। আজ যে কথাটা বার বার মনে পড়ছে তা হল— যখনই তাঁর কাছে কোনো অনুষ্ঠানের অনুরোধ নিয়ে গিয়েছি, কখনই ব্যর্থ হয়ে ফিরতে হয় নি। ছাতিমতলায় ৭ই পৌষে উপাসনা, বসন্তোৎসবে মঞ্চের অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক গান অথবা ২৫শে বৈশাখে জন্মদিনের মন্দিরের উপাসনায় তাঁর স্থায়ী আসন ছিল। এছাড়া তো পৌষ মেলার বিনোদনের মধ্যে তাঁর অনিবার্য উপস্থিতি ছিলই। রবীন্দ্রনাথের যুগ আমরা দেখি নি কিন্তু শান্তিদেব ছিলেন আমাদের কাছে সেই রবীন্দ্রযুগ ও একালের মধ্যে স্পর্শমাত্রা। যখনই উৎসব অনুষ্ঠান নিয়ে কোনোও সংশয় দ্বন্দ্ব অথবা বিতর্ক হয়েছে, তাঁর মতামতকে মান্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। অনেক খ্যাত ও গুণীজনের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য হয়েছে আমার শান্তিনিকেতনে সংস্কৃতির কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্রে। অন্যদের থেকে শান্তিদাকে স্বতন্ত্র মনে হয়েছে। তিনি যে বার বার বলতেন, আমি গুরুদেবের অন্ধভক্ত— তার বিশেষ কারণ রয়েছে। ভক্তি কোনো বিতর্ককে প্রশ্রয় দেয় না, সেখানে সংশয়ের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই। তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথই ছিল শেষ কথা। তিনি বিতর্কের ঊর্ধ্বে। সমস্ত সমাধানসূত্র আর জীবনযাপনের অন্বিষ্ট তিনি গুরুদেবের কাছ থেকেই গ্রহণ করতেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে শুধু শিল্পগুরু নয়, জীবনচর্চারও অনুধ্যান। যে গান তিনি বার বার গাইতেন তাঁর সে গানের সুর ও কথাকে ছাড়িয়ে এক মন্ত্রের আবহ তৈরি হত—

ওই আসনতলের মাটির 'পরে লুটিয়ে রব,
তোমার চরণ-ধুলায় ধুলায় ধূসর হব।
আমি তোমার যাত্রী দলের রব পিছে
স্থান দিয়ো হে আমায় তুমি সবার নীচে।
প্রসাদ লাগি কতই লোকে আসে ধেয়ে,
আমি কিছু চাইব না তো, রইব চেয়ে—
সবার শেষে যা বাকি রয় তাহাই লব।
তোমার চরণ-ধুলায় ধুলায় ধূসর হব।

এই গানই ছিল তাঁর সাধনার মন্ত্রবীজ। রবীন্দ্রসংগীত তাঁর কাছে স্বপ্রকাশের প্রদর্শনী ছিল না, ছিল একান্ত নিবেদন।

বিশ্বভারতীর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য তাঁর আগ্রহ আমাদের বিস্মিত করত। মনে পড়ছে কতবার বলেছেন তাঁকে যদি কোনো অনুষ্ঠানে গাইতে না বলা হয় তবে তাঁর কষ্ট হয়। অনুষ্ঠানের বহু আগেই ডেকে জিজ্ঞাসা করতেন— কি হে, আমাকে বাদ দেবে না তো। বলতেন মজা করে। কিন্তু বুঝতাম সেই দিনটির জন্য তাঁর অপেক্ষা তৈরি হচ্ছে মনে মনে। দীর্ঘকালের অভ্যাসে থাকা সত্ত্বেও, মনে মনে এক দীর্ঘ প্রস্তুতি যেন গড়ে উঠত তাঁর। আমার মনে হত তাঁর গান গাইতে না পারা যেন উপাসনার অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া। একবার শ্রীনিকেতনের এক অনুষ্ঠানে বিশ্বভারতীর অধ্যাপকদের বিষয়ে তাঁর এক বিরূপ মন্তব্যকে ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। এ কথা প্রচারিত হয়েছিল যে সেবার বসন্তোৎসবে তাঁকে গান গাইতে দেওয়া হবে না। ডেকে বলেছিলেন— আমাকে নাকি তোমরা গান গাইতে দেবে না। গান আমি গাইবই। দেখি কে বাধা দেয়। অনুষ্ঠানের দিন অবশ্য তাঁকে কোনো বাধার সম্মুখীন হতে হয় নি। কিন্তু তাঁর ভঙ্গি ছিল এরকমই স্থির নিশ্চিত।

যে কোনো অনুষ্ঠানে গান গাইবার কথা হলেই বার বার ডেকে পাঠাতেন। কখনো রিক্‌শা নিয়ে নিজেই চলে আসতেন। এই বয়সেও তাঁর ব্যগ্রতা আর নিষ্ঠা যে কোনো তরুণ অথবা প্রতিষ্ঠিত শিল্পীকে লজ্জা দেবে। গুরুদেবের জন্মদিনের অনুষ্ঠান হয় শান্তিনিকেতনে ১লা বৈশাখ। শান্তিদাকে অনুরোধ করলাম এবার অনুষ্ঠানে আপনাকে একটা কবিতা পাঠ করতে হবে। রাজি হলেন। অনুষ্ঠানের দিন দেখলাম —নিজেই বড়ো বড়ো করে কবিতাটা লিখেছেন। প্রতিটি শব্দ উচ্চারণের জন্য যেন কবিতার স্বরলিপি তৈরি করেছেন। প্রতিটি শব্দ উচ্চারণের ও স্বরের উত্থান-পতন,

ছেদ যতি চিহ্নবদ্ধ হয়ে আছে পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে। আমি অনেক খ্যাত আবৃত্তিকারদেরও দেখেছি কিন্তু এভাবে কবিতা পাঠের স্বরলিপি তৈরি করে আবৃত্তি করতে শুনি নি।

উৎসব অনুষ্ঠানে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলেই ক্ষুব্ধ হতেন। তাঁর রাগ প্রকাশের ভঙ্গি ছিল অকৃত্রিম। কিছু রেখে-ঢেকে বলতে জানতেন না। ডেকে পাঠিয়ে অনর্গল প্রকাশ ছিল তাঁর চরিত্রেরই অঙ্গ। আমরা এও জানতাম যত ক্ষুব্ধই তিনি হন না কেন— আমাদের অনুষ্ঠানের অনুরোধ তিনি উপেক্ষা করতে পারতেন না কখনো। তাই ক্রুদ্ধভাবে যা বলতেন বিনা প্রতিবাদে মাথা নিচু করে শুনে যেতাম। তারপর ধীরে ধীরে নিজেদের অনুষ্ঠানের প্রস্তাব দিতাম তাঁর কাছে। আবার সেই ঐকান্তিক আগ্রহ নিয়ে যোগ দিতেন অনুষ্ঠানে।

সেবার বৃক্ষরোপণ হচ্ছে তিন পাহাড়ের সংলগ্ন মাঠে। বৃক্ষরোপণ করবেন কবি শঙ্খ ঘোষ। ঠিক আগের মুহূর্তে শান্তিদা এসেই শঙ্খদাকে বললেন— তোমার উত্তরীয় কোথায়? সঙ্গে সঙ্গে নিজের গলা থেকে উত্তরীয় খুলে শঙ্খদাকে পরিয়ে দিলেন। সেই উত্তরীয় পরেই বৃক্ষরোপণ করলেন শঙ্খদা।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হয়তো অনেক পরিবর্তনই অপরিহার্য। অনেক কিছুই মেনে নিতে পারতেন না তিনি এবং এ ব্যাপারে তাঁর সরব প্রতিক্রিয়াও ছিল। এই ব্যাপক পরিবর্তনের মাঝে চিরকালই যে তিনি মাটির ঘরে বাস করে গেলেন— সেটাও এক ধরনের প্রতিবাদ। সেখানে বিলাসের স্বাচ্ছন্দ্য নেই, কিন্তু আছে রুচির পরিচয়, আছে স্বাতন্ত্র্যের নিজস্ব মুদ্রা। একজন মানুষ ছিলেন যাঁর কাছে সুনিশ্চিত স্থির চিত্র ছিল রবীন্দ্রসংস্কৃতির। সেখানে কোনো ধরনের আপস ছিল না তাঁর। গুরুদেব যে তাঁকে লিখেছিলেন— 'কোনো গুরুতর লোভেও নিজেকে যদি অশুচি করিস তাহলে আমার প্রতি ও আশ্রমের প্রতি অপমানের কলঙ্ক দেওয়া হবে'— সমস্ত জীবন এই দায়িত্বের ঋণই তিনি স্বীকার করেছেন।

শান্তিদেব ঘোষ : জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জি

নাম	শান্তিদেব ঘোষ।
জন্মতারিখ	২৪ বৈশাখ, ১৩১৭ ৭ মে, ১৯১০
জন্মস্থান	চাঁদপুর (অধুনা বাংলাদেশ)।
পিতা	কালীমোহন ঘোষ (শ্রীনিকেতন পল্লীসংগঠন প্রতিষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সহযোগী)
মাতা	মনোরমা ঘোষ
বিবাহ	১৯৪৬ সালে ইলা ঘোষের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন।
শিক্ষা	শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়। বালক বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে সংগীত, নৃত্য ও অভিনয়ে পারদর্শিতা অর্জন করেন। গুরুদেবের ইচ্ছানুসারে ১৯৩৭-৩৯ সালে ক্যান্ডি ও জাভা-বলীর নৃত্য শিখতে সিংহল, বর্মা ও ইন্দোনেশিয়ায় যান।
কর্মজীবন	১৯৩০ সালে সংগীত শিক্ষক হিসাবে বিশ্বভারতীতে যোগদান করেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রসংগীত ও নৃত্যের প্রফেসর এবং বিভাগীয় প্রধান হন। ১৯৪৬, ১৯৬৪-৬৮ এবং ১৯৭১-৭৩ তিনবারের জন্য সংগীতভবনের অধ্যক্ষ পদে বৃত হন।
অন্যান্য	ক. ১) কলকাতা আকাশবাণীর উপদেষ্টা সমিতির সদস্য (১৯৪৮)। খ. ২) দিল্লির সংগীত নাটক আকাদেমির প্রকাশন সমিতির সদস্য (১৯৫৬-৬০)। ৩) প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সংগীত শাখার সভাপতি, বোম্বাই (১৯৪৭)।

৪) আসাম সাহিত্য সম্মেলনের সংগীত বিভাগের সভাপতি (১৯৬৪)

খ. বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য এবং রবীন্দ্র-আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি রাশিয়া, ইংল্যান্ড, জাপান, বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কায় ভ্রমণ করেন।

সম্মান ও পুরস্কার : পদ্মভূষণ ১৯৮৪
দেশিকোত্তম (বিশ্বভারতী) ১৯৮৫
ডি. লিট. (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়) ১৯৮৬
ডি. লিট. (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়) ১৯৯১
ডি. লিট. (কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়) ১৯৯৬
আলাউদ্দীন পুরস্কার (পশ্চিমবঙ্গ সরকার) ১৯৯৭
রাজ্য আকাদেমি পুরস্কার ১৯৯৭
শিরোমণি পুরস্কার ১৯৯০
আনন্দ পুরস্কার (আনন্দবাজার পত্রিকা) ১৯৮০
তাম্রফলক (পশ্চিমবঙ্গ সরকার) ১৯৮১
ফেলো : সংগীত নাটক আকাদেমি, দিল্লি ১৯৭৭
রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী বিশেষ পদক, রাশিয়া ১৯৬১
রবীন্দ্র তত্ত্বাচার্য (টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলকাতা)
রথীন্দ্র পুরস্কার (রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি)

মৃত্যু ১ ডিসেম্বর, ১৯৯৯·

প্রকাশিত পুস্তক :

১। রবীন্দ্রসংগীত। কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৪৯

২। জাভা ও বলির নৃত্যগীত। কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৫৯

৩। ভারতীয় গ্রামীণ সংস্কৃতি। কলকাতা, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানি, ১৩৬২

৪। গ্রামীণ নৃত্য ও নাট্য। কলকাতা, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানি, ১৩৬৬

৫। রূপকার নন্দলাল। কলকাতা, দেবকুমার বসু, ১৩৬৯

৬। রবীন্দ্রসংগীত বিচিত্রা। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৩৭৯

৭। রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাদর্শে সংগীত ও নৃত্য। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৩৮৫

৮। Music and dance in Rabindranath Tagore's education philosophy. New Delhi, Sangeet Natak Akademi, 1978.

৯। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৩৯০

১০। জীবনের ধ্রুবতারা। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৪০৩

১১। নৃত্যকলা ও রবীন্দ্রনাথ। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৪০৬

সংকলিত গ্রন্থে প্রবন্ধের তালিকা

১। রবীন্দ্র জীবনের শেষ বৎসর। *In* বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত রবীন্দ্র স্মৃতি : কলকাতা, ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৩৬৮ পৃ ২৪৭-২৫৪।

২। রবীন্দ্রসংগীতের বৈশিষ্ট্য। *In* ভবেশ দাশগুপ্ত সম্পাদিত সৃজনী : রবীন্দ্র-শতবর্ষপূর্তি স্মারক সংকলন : কলকাতা, ভবেশ দাশগুপ্ত, ১৩৬৮ পৃ ৯৫-৯৮।

৩। রবীন্দ্র সাধনায় সংগীত ও নৃত্য। *In* অশোক বিজয় রাহা সম্পাদিত রবীন্দ্র জন্ম-শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান সম্মেলনের কার্যবিবরণী, চতুর্থ খণ্ড : বিশ্বভারতী, রণজিৎ রায়, ১৩৬৮ পৃ ১২৭-১৩৬।

৪। [সংগীত বিষয়ক প্রবন্ধ]। *In* বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলন রবীন্দ্র-স্মারক গ্রন্থ : কলকাতা, ১৩৬৮ পৃ ৮৮-৯১।

৫। Sikshasatra and Naitalimi education. *In* Santosh Chandra Sengupta ed. Rabindranath Tagore : Homage from Visva-Bharati : Santiniketan, Visva-Bharati, 1962 p 121-138.

৬। গুরুদেবের গান। *In* বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত রবীন্দ্র বিচিত্রা : কলকাতা, সাহিত্যম্, ১৩৭৯ পৃ ১৭২-১৭৯।

৭। Rabindranath's songs and Santiniketan. *In* B. Chawdhuri & K. G. Subramyan ed. Rabindranath Tagore and the challenges of today : Shimla, Indian Institute of Advanced study, 1988 p. 160-164.

৮। রবীন্দ্রনাথের গানে ঠুংরির প্রভাব। *In* সুব্রত রুদ্র সম্পাদিত রবীন্দ্রসংগীত চিন্তা : কলকাতা, আশা প্রকাশনী, ১৩৮৬ পৃ ১০০-১২৪।

৯। বাংলার লোকনৃত্য ও লোকসংগীতে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের স্থান। *In* রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ। কলকাতা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৩৯৫ পৃ ৪৫-৪৯।

১০। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের গান। *In* আমি যে গান গেয়েছিলাম : রবিতীর্থ সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ। কলকাতা, রবিতীর্থ, ১৪০৩ পৃ ১৪৩।

১১। গানের অভিষেক। *In* আলপনা রায় সম্পাদিত ঐ আসনতলে : সপ্তক দশকপূর্তি স্মারক-সংকলন। শান্তিনিকেতন, সপ্তক, ১৪০৮ পৃ ১-২।

'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত রচনার বর্ণানুক্রমিক সূচী

রচনা	প্রকাশ
১। উচ্চাঙ্গ ভারতীয় সংগীতানুরাগী রবীন্দ্রনাথ	সাহিত্য সংখ্যা ১৯৮৬ পৃ ৮৭-১০২
২। উপেক্ষিত গ্রামীণ সংস্কৃতি	বর্ষ ১৭, সংখ্যা ৫, ৩ ডিসেম্বর, ১৯৪৯ পৃ ২১৯-২২১
৩। গীতিনাট্য বাল্মীকি প্রতিভা	বর্ষ ৬৮, সংখ্যা ৩৪, ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৮১ পৃ ৪৬-৪৭
৪। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা ও বাউলদের মনের মানুষের ধর্ম	সাহিত্য সংখ্যা ১৯৮৭ পৃ ৭৩-৭৭
৫। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সাধনা	বর্ষ ৪১, সংখ্যা ২৮, ১১ মে, ১৯৭৪ পৃ ৯৭-১০১
৬। গ্রামীণ সংস্কৃতি ও শিক্ষা	বর্ষ ২১, সংখ্যা ৩, ২১ নভেম্বর, ১৯৫৩ পৃ ১৬১-১৬৪
৭। গ্রামের শিক্ষায় নাচ	বর্ষ ১৮, সংখ্যা ৪, ২৫ নভেম্বর, ১৯৫০ পৃ ১৭০-১৭১
৮। জাভা ও বলির নৃত্যনাট্য	শারদীয় ১৯৫২ পৃ ১১০-১১৫
৯। 'তাসের দেশ' রচনা ও নৃত্যাভিনয়ের কথা	সাহিত্য সংখ্যা ১৯৭৮ পৃ ৭৩-৮৬
১০। দক্ষিণ ভারতের ছায়ানৃত্য	শারদীয় ১৯৫৩ পৃ ১৩৮-১৪০
১১। দলবদ্ধ নাচের তাৎপর্য	শারদীয় ১৯৫০ পৃ ১৯১-১৯২
১২। নব্য ভারতীয় নৃত্যে রবীন্দ্রনাথ ও উদয়শঙ্কর	শারদীয় ১৯৪৫ পৃ ৪১-৪৫
১৩। নিউ এম্পায়ারে ভারত নাট্যম	বর্ষ ১২, সংখ্যা ৪০, ১১ অগস্ট, ১৯৪৫ পৃ ৪০-৪১
১৪। প্রজাতন্ত্র দিবসে লোকনৃত্য উৎসব	বর্ষ ২৪, সংখ্যা ১৮, ২ মার্চ, ১৯৫৭ পৃ ৩১৮-৩২৩
১৫। প্রাচীন ভারতের নাচ	শারদীয় ১৯৫৭ পৃ ১০৩-১০৭
১৬। বাউল নাচ	বর্ষ ১৬, সংখ্যা ১, ৬ নভেম্বর, ১৯৪৮ পৃ ১৭-২০
১৭। বাংলা স্বরলিপির ইতিহাস	সাহিত্য সংখ্যা ১৯৬৬ পৃ ৫৯-৬৪

১৮। বাঙালী জীবনে বিলাতি সংস্কৃতির প্রভাব	বর্ষ ৩৬, সংখ্যা ৩৪, ২১ জুন ১৯৬৯ পৃ ৮৫৩-৮৬৩
১৯। বাঙালী জীবনে রবীন্দ্রসংগীত	সাহিত্য সংখ্যা ১৯৯১ পৃ ১১৩-১১৭
২০। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা পর্বে রবীন্দ্র বিরোধিতা	বর্ষ ৪৪, সংখ্যা ৪১, ৬ অগস্ট, ১৯৭৭ পৃ ১৭-২২
২১। বীরভূমের সাংস্কৃতিক জীবন	সাহিত্য সংখ্যা ১৯৬৫ পৃ ১০৭-১১৬
২২। বেতারে ভারতীয় সংগীত	শারদীয় ১৯৪৮ পৃ ৬২-৬৪
২৩। ভারত ও এশিয়ার নৃত্যাভিনয়	বর্ষ ১৪, সংখ্যা ২০, ২২ মার্চ, ১৯৪৭ পৃ ৩০১-৩০৩
২৪। ভারতীয় কংগ্রেসের বত্রিশতম অধিবেশনের গান	বর্ষ ৪৬, সংখ্যা ৩, ১৮ নভেম্বর, ১৯৭৮ পৃ ৫৭-৫৯
২৫। ভারতীয় লোকনৃত্য	শারদীয় ১৯৫৮ পৃ ১৮৪-১৮৬
২৬। ভারতীয় সংগীতে বাংলার স্থান	বর্ষ ১৫, সংখ্যা ৯, ৩ জানুয়ারি, ১৯৪৮ পৃ ৩৮১-৩৮৭
২৭। ভারতীয় সংগীতের ধর্ম ও রবীন্দ্রনাথের গান	বর্ষ ১১, সংখ্যা ৭, ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৪৩ পৃ ১৯৯-২০১
২৮। ভারতীয় সংগীতে হারমোনিয়ম যন্ত্রের অপকারিতা	বর্ষ ৭, সংখ্যা ২৩, ২০ এপ্রিল, ১৯৪০ পৃ ৪৩৮-৪৪০
২৯। মণিপুরী মহারাস নৃত্যাভিনয়	বর্ষ ২২, সংখ্যা ২, ১৩ নভেম্বর, ১৯৫৪ পৃ ১১১-১১৬
৩০। জাভা ও বলিদ্বীপের নৃত্যনাট্য	বর্ষ ৭, সংখ্যা ৪৭, ৫ অক্টোবর, ১৯৪০ পৃ ৪২৩-৪২৬
৩১। য়ুরোপের ব্যালে নাচের প্রকৃতি	শারদীয় ১৯৪৬ পৃ ৭৭-৮০
৩২। রবীন্দ্র জীবনে গীতরচনার একটি অজ্ঞাত যুগ	শারদীয় ১৯৭১ পৃ ৮২-১০৮
৩৩। রবীন্দ্র জীবনের একদিক	বর্ষ ১০, সংখ্যা ২৬, ৮ মে, ১৯৪৩ পৃ ৩৫৯-৩৬১
৩৪। রবীন্দ্র জীবনের শেষ বৎসর	বর্ষ ৯, সংখ্যা ২৬, ৯ মে, ১৯৪২ পৃ ৫৯৬-৫৯৯ ও ৬০৯
৩৫। রবীন্দ্রনাট্যে মঞ্চ সজ্জার বিকাশ	শারদীয় ১৯৪৯ পৃ ১৬৪-১৬৮
৩৬। রবীন্দ্রনাথের উত্তেজক সংগীত	বর্ষ ৯, সংখ্যা ২৪, ২৫ এপ্রিল, ১৯৪২ পৃ ৪৮৫-৪৮৭

৩৭।	রবীন্দ্রনাথের একটি গান	বর্ষ ১১, সংখ্যা ১২, ২৯ জানুয়ারি, ১৯৪৪ পৃ ২৫৭-২৫৮
৩৮।	রবীন্দ্রনাথের একটি গান	বর্ষ ১৫, সংখ্যা ৩৩, ১৯ জুন, ১৯৪৮ পৃ ২৮৯-২৯১
৩৯।	রবীন্দ্রনাথের গান রচনা	বর্ষ ৯, সংখ্যা ৩৯, ৮ অগস্ট, ১৯৪২ পৃ ৫০-৫৪
৪০।	রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য	বর্ষ ১৬, সংখ্যা ২৭, ৭ মে, ১৯৪৯ পৃ ১৭-২৪
৪১।	রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য	বর্ষ ৯, সংখ্যা ১, ১৬ নভেম্বর, ১৯৪১ পৃ ২০-২৪
৪২।	রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য ও তার অভিনয়	সাহিত্য সংখ্যা ১৯৫৮ পৃ ১২৯-১৩২
৪৩।	রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা	বর্ষ ৪৪, সংখ্যা ৩৪, ১৮ জুন, ১৯৭৭ পৃ ১৭-২২
৪৪।	রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষায় সংগীত, নৃত্য ও অভিনয়ের স্থান	সাহিত্য সংখ্যা ১৯৭৩ পৃ ৫৮-৮৪
৪৫।	রবীন্দ্রনাথের বাউল গান	বর্ষ ৮, সংখ্যা ২৬, ১০ মে, ১৯৪১ পৃ ৫১-৫৩ ও ৬৫
৪৬।	রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাসত্র ও মহাত্মাজীর বুনিয়াদী শিক্ষা	বর্ষ ১৭, সংখ্যা ২৭, ৬ মে, ১৯৫০ পৃ ৩০-৩৫
৪৭।	রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের ক্রমবিকাশ	বিনোদন ১৯৭০ পৃ ১০-২৪
৪৮।	রবীন্দ্র প্রবর্তিত নৃত্য	বিনোদন ১৯৮৭ পৃ ৩৬-৪১
৪৯।	রবীন্দ্রসংগীত	বর্ষ ৮, সংখ্যা ৪০, ১৬ অগষ্ট, ১৯৪১ পৃ ৬৭২-৬৭৩ ও ৬৭৮
৫০।	রবীন্দ্রসংগীত স্বরলিপি	সাহিত্য সংখ্যা ১৯৫৬ পৃ ৭৩-৭৪
৫১।	রবীন্দ্রসংগীতে ছন্দ বৈচিত্র্য	বর্ষ ১৮, সংখ্যা ৩৫, ১ জুন, ১৯৫১ পৃ ৫২৭-৫২৯
৫২।	রবীন্দ্রসংগীতে ধ্রুপদের প্রভাব	বিনোদন ১৯৮৪ পৃ ৩৫-৩৯
৫৩।	রবীন্দ্রসংগীতে বাংলাদেশী সুরের প্রভাব	বর্ষ ১৮, সংখ্যা ২৭, ৫ মে, ১৯৫১ পৃ ২৭-৩০
৫৪।	রবীন্দ্রসংগীতে স্বরলিপি বিভ্রাট	বর্ষ ৪৩, সংখ্যা ৩০, ২২ মে, ১৯৭৬ থেকে বর্ষ ৪৩, সংখ্যা ৩১, ২৯ মে, ১৯৭৬

৫৫।	রবীন্দ্রসংগীতের বৈশিষ্ট্য	সাহিত্য সংখ্যা ১৯৫৫ পৃ ১২৫-১৩০
৫৬।	রবীন্দ্র সাধনায় সংগীত ও নৃত্য	সাহিত্য সংখ্যা ১৯৬২ পৃ ১৩৭-১৪৪
৫৭।	রূপকার নন্দলাল	বিনোদন ১৯৮২ পৃ ১৭-২৭
৫৮।	লোকনৃত্য উৎসব	বর্ষ ২৭, সংখ্যা ১৯, ১২ মার্চ, ১৯৬০ পৃ ৪৩৩-৪৩৯
৫৯।	শান্তিনিকেতনের উৎসবপতি দিনেন্দ্রনাথ	বর্ষ ৫০, সংখ্যা ১৩, ২৯ জানুয়ারি, ১৯৮৩ পৃ ১২-১৪
৬০।	শান্তিনিকেতনের নৃত্য আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের দান	সাহিত্য সংখ্যা ১৯৬১ পৃ ১০১-১০৩
৬১।	'শাপমোচন' নৃত্যনাট্যের ইতিকথা	বিনোদন ১৯৮১ পৃ ৫-২৮
৬২।	শিলচরের 'ধামাইল' ও 'বউনাচ'	শারদীয় ১৯৫৪ পৃ ১০২-১০৪
৬৩।	শিল্পাচার্য নন্দলাল	বর্ষ ৯, সংখ্যা ৪১, ২২ অগস্ট, ১৯৪২ পৃ ১০৯-১১২ ও ১১৪
৬৪।	সংগীতে রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবন	বর্ষ ৮, সংখ্যা ৪৬, ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ পৃ ৯৫৯-৯৬১
৬৫।	সংগীত সাধক আলাউদ্দীন খাঁ	বর্ষ ৩৯, সংখ্যা ৪৬, ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭২ পৃ ৬৬৫-৬৭৫
৬৬।	সাতই পৌষ : উৎসব ও মেলা	বর্ষ ৬২, সংখ্যা ৪, ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৯৪ পৃ ৩৯-৪৮
৬৭।	হিন্দি গান ও রবীন্দ্রনাথ	বর্ষ ১৫, সংখ্যা ২৭, ৮ মে, ১৯৪৮ পৃ ১২-১৭
৬৮।	হিমালয়ের পথে	বর্ষ ১০, সংখ্যা ১, ১৪ নভেম্বর, ১৯৪২ থেকে বর্ষ ১০, সংখ্যা ৩, ২৮ নভেম্বর, ১৯৪২

চেষ্টা সত্ত্বেও কিছু রচনা সূচীবদ্ধ করা গেল না। আশা করি ভবিষ্যতে সে চেষ্টা সম্পূর্ণ হবে।

সংকলক : আশিসকুমার হাজরা

শান্তিদেবের প্রথম গ্রন্থ : রবীন্দ্রসংগীত— কয়েকটি অভিমত

আনন্দবাজার পত্রিকা— ২রা ফাল্গুন, ১৩৪৯

শান্তিনিকেতনের শ্রীশান্তিদেব ঘোষ রবীন্দ্রসংগীত সম্বন্ধে একখানি খাশা বই লিখেছেন। বইখানির একাধিক অধ্যায় প্রবন্ধাকারে যখন প্রকাশিত হচ্ছিল তখনই লেখককে অভিনন্দন জানাই। তাঁর ঝরঝরে ভাষা, সংগীতে অনুরাগ ও জ্ঞান দেখেই কেবল মুগ্ধ হই যে তা নয়, তাঁর বক্তব্যের সঙ্গেও আমার মিল ছিল।...

... অনেক-কিছু নতুন জিনিস আছে বইখানিতে। তার মধ্যে সব চেয়ে মূল্যবান রবীন্দ্রনাথের রচনা-রীতির ইঙ্গিত। শান্তিদেববাবু রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ পেয়েছেন, তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছেন, তাঁর সদ্য-রচিত গানের পরিবেশনে পুষ্ট হয়েছেন। তা ছাড়া তিনি দিনুবাবুর ছাত্র— এর ব্যাখ্যার কি প্রয়োজন আছে? এত বড়ো সুযোগের সুষ্ঠু ব্যবহার কম বাহাদুরি নয়। রবীন্দ্রনাথের কাছে কথা ও সুর যুগ্ম-প্রত্যয় ছিল, (শেষে নৃত্যও হয়েছিল ত্রিমূর্তির একটি)— এই মর্ম-কথাটি না জানলে রবীন্দ্রসংগীত বোঝা যায় না। নানা উপায়ে লেখক আমাদের মনে এই তত্ত্বটি পৌঁছে দিয়েছেন। ফলে আমাদের বহু উপকার হয়েছে এবং আরো হবে, যদি প্রত্যেক শিক্ষিত পুরুষ ও স্ত্রী বইখানি কিনে পড়েন, কিংবা পাঠ্য-পুস্তক হিসেবে পড়তে বাধ্য হন।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

যুগান্তর— ফাল্গুন, ১৩৫০

ভালো লাগার ক্ষমতা যেমন অনায়াস-সঞ্জাত, ভালো লাগানো তেমন সহজ নহে। রবীন্দ্রসংগীতের যাদু-অরণ্যে শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ এই দিশারীর কাজ করিয়াছেন, আর এ কাজে তাহার অপেক্ষা যোগ্যতর আর কেহই-বা হইতে পারিতেন। ... রবীন্দ্রনাথের গান যে স্বতন্ত্র কিছু অপরূপ বস্তু নহে, তাহার ভিত্তি যে ভারতীয়

ঐতিহ্যের মর্মকেন্দ্রে, চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে এই প্রয়োজনীয় তথ্য পরিবেশন করিয়া শান্তিদেববাবু ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। প্রসঙ্গত আরো অনেক তথ্য জানা গেল যাহা রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসায় মাইল-প্রস্তরের কাজ করিবে।

দেশ— ১৫ই ফাল্গুন, ১৩৪৯

রবীন্দ্রনাথের সাংগীতিক জীবন সম্বন্ধে সম্প্রতি প্রকাশিত শ্রীশান্তিদেব ঘোষের 'রবীন্দ্র-সংগীত'খানি অমূল্য বলে পরিগণিত হবে। কারণ, শান্তিদেব রবীন্দ্রনাথের সাধের সাধনাকুঞ্জ শান্তিনিকেতনের ছায়া-সুশীতল সুরবিতানে বর্ধিত হয়েছিলেন। কবির ছাত্র রূপে বন্ধু রূপে সহকর্মী রূপে তিনি তাঁর সংগীত-প্রয়োজনে, অভিনয়ের পরিকল্পনায় যোগদান করতে পেরেছিলেন। এই অন্তরঙ্গ-যোগের সুযোগ যে শান্তিদেব পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করতে পেরেছিলেন, তাঁর লেখার প্রতি ছত্রে তার পরিচয় আছে। নিজে সংগীত, গীতবাদ্য ও নৃত্য-বিদ্যায় অভিজ্ঞ না হলে রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়করী প্রতিভার ভগ্নাংশমাত্র গ্রহণ করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।...

তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগসূত্রের ফলে তিনি গান-রচনার ইতিহাস যে-প্রণালীতে সংগ্রহ করেছেন, নিঃশেষে তার প্রশংসা করা যায়। শুধু গান রচনা নয় গানে সুর-যোজনা সম্বন্ধেও তিনি অনেক অমূল্য তথ্য সন্নিবিষ্ট করেছেন।... কবির সাংগীতিক জীবনের সহিত যাঁরা নিবিড় পরিচয় লাভ করতে ইচ্ছুক, তাঁদের পক্ষে গ্রন্থখানি অপরিহার্য হবে।... আলোচ্য "রবীন্দ্র-সংগীতে" প্রাণশক্তি যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান। নৃত্যকুশল গ্রন্থকার কবির গানের ছন্দটি অতি নিপুণভাবেই ধরতে পেরেছেন বলে আমি বিশ্বাস করি। সুতরাং সংগীতামোদী ও কাব্যরসিক উভয়েই এই বইখানির সমাদর করতে পারবেন।

বিশেষজ্ঞও এতে অনেক ভাববার জিনিস পাবেন।

অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র

কবিতা— আষাঢ়, ১৩৫০

শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষের 'রবীন্দ্র-সংগীত' বইখানি পড়ে খুবই আনন্দ হল। এরকম একখানা বইয়ের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল।

এর আগে রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে এতখানি বিশদ আলোচনা বোধ হয় আর কেউ করেন নি। শান্তিদেববাবু অনেকদিন ধরে রবীন্দ্রসংগীতের সাধনা করছেন, তা

ছাড়া রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সংশ্রব ছিল, তাই বইখানা ভাবের দিক থেকে উজ্জ্বল ও তথ্যের দিক থেকে মূল্যবান হয়েছে। লেখক কোনোরকম পারিভাষিক জটিলতার মধ্যে পাঠককে টেনে নিয়ে যান নি, সহজ ভাষায় সকলের জন্য লিখেছেন, রবীন্দ্রসংগীতের বৈশিষ্ট্যের প্রধান সূত্রগুলি ধরিয়ে দেওয়াই তাঁর চেষ্টা। কোন্ গান কী উপলক্ষে বা কোন্ ঘটনার প্রতিঘাতে লিখিত এ-খবরগুলো আমাদের পক্ষে অত্যন্তই ঔৎসুক্যের বিষয় ছিল, এ বইটি পেয়ে অনেকখানি তৃপ্তিলাভ হল সন্দেহ নেই।

প্রথম বই, এবং প্রথম ভালো বই হিসেবে "রবীন্দ্র-সংগীত" উল্লেখযোগ্য হয়ে রইল।

প্রবাসী— মাঘ, ১৩৪৯

রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর সংগীতকে রচনাবলীর মধ্যে কত বড়ো স্থান দিয়ে গিয়েছেন তা আমরা জানি অথচ এ পর্যন্ত পত্রিকাদির মধ্যে টুক্‌রো-টাক্‌রা প্রবন্ধ ছাড়া কোনো বই লেখা হয় নি। শান্তিদেব ঘোষ সেই অভাব দূর করতে প্রথম চেষ্টা করেছেন বলে তিনি প্রশংসার্হ। রবীন্দ্রসংগীতের জমাট আবহাওয়ায় শান্তিনিকেতনে তিনি মানুষ হয়েছেন। তার পরিচয় এ পুস্তকের প্রতিছত্রে পাওয়া যায়। কবির জীবনে শেষ কুড়ি-পঁচিশ বছরের মধ্যে যে-সব গান রচিত হয়েছে তার সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের মতো তিনি আলোচনা করেছেন এবং এই আলোচনা আরো বিশদভাবে তিনি করে যাবেন এই আশা আমরা করি। তিনি স্বর্গীয় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রিয় শিষ্য এবং দিনেন্দ্রনাথের অকাল মৃত্যুতে আমাদের যে বিষম ক্ষতি হয়েছে তা কতকটা পূরণ করতে তিনি সচেষ্ট হবেন আশা করা যায়।

শান্তিদেব এ বিষয়ে আমাদের ঔৎসুক্য জাগিয়েছেন এবং এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সুররসিক কবির জীবনের নিভৃত কক্ষে আলোকপাত করেছেন বলে তাঁর বইখানির বহুল প্রচার প্রার্থনা করি।

কালিদাস নাগ

শনিবারের চিঠি— ফাল্গুন, ১৩৪৯

শান্তিদেব ঘোষ প্রণীত 'রবীন্দ্র-সংগীত' পুস্তকখানিও উল্লেখযোগ্য। এই বইটির নিছক টেক্‌নিকেল অংশ বাদ দিলেও সাধারণ পাঠকের জানিবার মতো অনেক খবর ইহাতে আছে। আমরা রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গান ও সেগুলির রচনা-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা

শুনিতে শুনিতে মানুষ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও অনেক কথা জানিতে পারিয়া লেখকের প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়াছি।

সংগীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা— আশ্বিন, ১৩৫০

এই পুস্তকটি রবীন্দ্রনাথের 'কাব্য-পরিক্রমা'-র ন্যায় 'সংগীত-পরিক্রমা'-ও বলা যেতে পারে। আমাদের জ্ঞাতসারে এর চেয়ে রবীন্দ্রসংগীতের সুন্দরতর বিশ্লেষণ বঙ্গভাষায় আর কখনো প্রকাশিত হয় নাই। গ্রন্থকার রবীন্দ্রসংগীত সম্বন্ধে প্রামাণ্য কথা বলবার অধিকার রাখেন। কেন-না আবাল্য তিনি রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সংস্পর্শে রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিমণ্ডলের মধ্যে মানুষ। তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ প্রভাবের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে। তাঁর সুরশিক্ষক রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। সারা জীবন তিনি রবীন্দ্র-সংগীতের বহমান সুধাস্রোত পান করেছেন। এরূপ প্রত্যক্ষ অনুভূতিসম্পন্ন লেখক ও শিল্পী ব্যতীত রবীন্দ্রসংগীতের রসবিতান কেই-বা লেখনীর সাহায্যে খুলে ধরতে পারে।

বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

চতুরঙ্গ— পৌষ, ১৩৪৯

শান্তিদেববাবু যে রবীন্দ্রসংগীত সম্বন্ধে আলোচনা করবার যোগ্যতম ব্যক্তি, সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তিনি সুদীর্ঘকাল শান্তিনিকেতনে সংগীত-শিক্ষক হিসাবে থেকে নিরন্তর কবির দুর্লভ সাহচর্য লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের গানে সুর-সংযোগ বিষয়েও তিনি নানা প্রকারে কবিকে সাহায্য করতেন। এ অবস্থায় শান্তিদেববাবুর লেখা 'রবীন্দ্র-সংগীত' যে প্রামাণ্য গ্রন্থ হবে তাতে আশ্চর্যের কি আছে?...

... রবীন্দ্রনাথের অদ্ভুত সংগীত-প্রতিভা কি করে এই বিচিত্র জটিল সংগীত-পদ্ধতির মধ্য থেকে মধু আহরণ করে আমাদের জন্য মধুচক্র রচনা করে গেছেন, গ্রন্থকার নিপুণভাবে সে ইতিহাস বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছেন। অনেকের ধারণা আছে যে রবীন্দ্রনাথ বুঝি স্বীয় কবি-প্রতিভার সাহায্যে খেয়াল মতো গান লিখে যেতেন; এ ধারণা যে কত মিথ্যা, এ বইখানি পড়লেই তা' বোঝা যাবে।...

শান্তিদেববাবু এত সহজ ভাষায় সংগীতের কঠিন প্রশ্নগুলো আলোচনা করেছেন যে প্রথম সংগীত-শিক্ষার্থীর পক্ষেও বর্তমান গ্রন্থ দুর্বোধ্য নয়।

গোপাল ভৌমিক

সোনার বাংলা— ১৩ই চৈত্র, ১৩৪৯

রবীন্দ্রসংগীত সম্বন্ধে ইতিপূর্বে মাসিক পত্রাদিতে ছোটোখাটো আলোচনা দেখিয়াছি। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো যথাযোগ্য আলোচনা বাহির হয় নাই। সেই দিক হইতে গ্রন্থকারকে আমরা পথিকৃৎ হিসাবে অভিনন্দন করি। রবীন্দ্রনাথের সংগীতের আঙ্গিকের দিকটি ভবিষ্যতে যাঁহারা আলোচনা করিবেন তাঁহাদেরও এই গ্রন্থ কাজে আসিতে পারে।

Modern Review— 1943

Here, at last, is an authoritative book on Rabindranath's music written by one who has been intimately associated with the poet in Santiniketan and who has earned distinction as a fine exponent of his songs. Manifold aspects of Rabindranath's musical genius are here treated with precise knowledge and with creative taste...

The author treats his theme with erudition and with a critical mind, not forgetting either that the songs, coming from a master poet, have their perennial lyrical value as well.

The author has done well in emphasising the elemental power and sweep of Rabindranath's music.

Rabindra-Sangit calls for translation into different Indian vernaculars and into languages other than Indian so that the author's contribution can be properly valued, assimilated and critically estimated on a basis of musicology.

Hindusthan Standard— January, 1943

Shri Santidev Ghosh, undaunted by this almost inserperable difficulty and aided by his own deep devotion to the glorious singer and his great art, has now presented to the public a thought-provoking, as it is wonder-evoking, book on the subject.

Further, Shri Santidev Ghosh had the rare privilege of being admitted into the green-room of the poet's genius. He had the blessedness of often seeing him in the course of his creative process. This is why one of the many striking features of his book is his telling his readers the background and basis of many of the poet's

songs which are on the lips of thousands to day.

Shri Santidev has documented his interpretation or analysis, call it one may what he will, of the poet's music with appropriate quotations from the latter's multifarious writings. He has, further, dealt with his complex theme in a homely style, even the technical part has been made easily intelligible for the layman. ... In short, 'Rabindra-Sangita' is a helpful study in the genius, 'genre' and genesis of the poet's song.

Visva-Bharati News— February, 1943

Sj. Santideva Ghosh's Rabindra-Sangit, which was published on the 7th Pous, is an informative and appreciative study of Gurudeva's music, besides being a pioneer attempt in the field. It touches upon the many aspects of Gurudeva's songs and explains the traditions that influenced him and the new modes he initiated to enrich the variety and vitality of Indian music.

Sindh Observer— 1-2-43

Its author, who is one of the teachers at Santiniketan, has had the great good fortune of having peeped at the poet, for years, through the key-hole, so to speak. For, no sooner was a new song ready than at once it was communicated by him, among others, to Mr. Ghosh. Thus, having heard a large number of his songs from his own lips, while the vital feeling of delight and of discovery of further spiritual depth were still fresh and full, the author succeeded not a little in finding a way into the hinterland of the Poet's creative consciousness."

"Rabindra-Sangita" is so useful both from the point-of-view of information about and that of interpreting the "motif" of, the Poet's songs that the reviewer hopes that it will be translated into English as well as Hindi, so that those who do not know Bengali may have access to the author's thesis.

Prabudha-Bharata— November, 1943

Mr. Ghose, who is a talented musician himself and had lived in close touch with Rabindranath for several years, deserves our heartiy congratulations on his very worthy attempt to show in this lucidly written book the contribution of the great poet in the field of Indian Music. ... An instructive chapter has been devoted to Rabindranath's dramas and another to his signal contributions in the sphere of Hindu dancing. The biographical thouches here and there have made the book immensely interesting.

বিশ্বভারতী পত্রিকা (হিন্দি)— বৈশাখ, ২০০০ বিক্রম সংবৎ

সদ্যঃ প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-সংগীত' বংলা পুস্তক কো পড়কর সবসে অধিক বিস্ময় হুয়া কি লেখক যথাসংভব শাংত ঔর সংযত ভাবসে চিন্তা করতে গয়ে হৈঁ। বচপন সে হি রবীন্দ্রসংগীত কে স্বর-বিতান মেঁ উনকা মন পলা-বড়া বৈ ঔর রবীন্দ্রনাথ কে নিকট হি উন্‌হোনে সংগীত কী শিক্ষা পাই হৈ; পরবর্তী জীবন মে গুরুদেব আদর্শ কো সাকার করতে, গাতে ঔর গাবাতে, উনকে দিন কটে হৈঁ। ফিরভি চেলে কো যুক্তিতর্কশূন্য ভক্তি দ্বারা আলোচনা কো উন্‌হোনে আবিল নহী হোনে দিয়া হৈ। কবি কে সংগীত কে মর্ম কো উন্‌হোনে আয়ত্ত কিয়া হৈ, ইসিসে উস্‌কে বৈচিত্র্য ঔর বৈশিষ্ট্য কা হমেঁ পরিচয় করা সকে হৈঁ। ভাষা ইস তরহ্ সুথরী ঔর সুল্‌ঝী হৈ কি শাস্ত্রীয় জ্ঞান সে উদাসীন পাঠক ভী পুস্তক পড়কর লাভ উঠা সক্‌তে হৈঁ।

লেখক নে রবীন্দ্রসংগীত কো নানা দিশাওঁ সে সমঝনে— সমঝানে কী চেষ্টা কী হৈ। ভারতীয় সংগীত কো ঐতিহাসিক বিকাশ-ধারা মেঁ রবীন্দ্রনাথ কা ক্যা মূল্য ঔর স্থান হৈ, সমসাময়িক সংগীত-ক্ষেত্র মেঁ উস্‌কা ক্যা প্রভাব পড়া হৈ ঔর ভবিষ্য কেঁ বিকাস কো উন্‌হোনে কহাঁ তক দিশা দী হৈ আদি প্রসংগোপর বিচার কিয়া গয়া হৈ।

পুস্তক কা এক ঔর ভী বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কে যোগ্য হৈ। রবীন্দ্রনাথ কে গীতোঁ কা ঠীক ইতিহাস— রীতি কো দৃষ্টিসে ভী ঔর রস কী তরফ সে ভী— বহুত-কুছ রহস্যাগার মেঁ হী বংদ পড়া থা। অনেক গীতো কে সমুচে পরিবেশ কো লেখক নে অপনী জানকারিয়োঁ কী সহায়তা সে হমারে লিয়ে সুলভ কিয়া হৈ।

বিশাল ভারত (হিন্দি)– পৌষ, ১৩৪৯

প্রস্তুত পুস্তকমেঁ রবীন্দ্রসংগীতকা স্বরূপ, বিকাস তথা সৃজন-কালকী অজ্ঞাত কহানিয়াঁ সুনাই গই হৈঁ। ... ইস্ পুস্তককে লেখক্নে অশেষ কৌশলকে সাথ ঠসী কার্যকো অনায়াস হী সম্পন্ন কিয়া হৈ। উন্হে স্বয়ং কবিগুরুকে নিকট সংগীত সীখ্নেকা সৌভাগ্য মিলা থা, ইসোলিয়ে উনকে অনেক গীতোঁকো অনেক রহস্যাগার সে বাহর লাকর পাঠকোঁ তক উনকা মর্ম পহুঁচানেকে বে সহজ হী অধিকারী হৈ।... ভবিষ্যমেঁ রবীন্দ্র-সংগীতকে সম্বন্ধেমেঁ আলোচনা অথবা অন্বেষণ করনেবালে প্রত্যেক জিজ্ঞাসুকো ইসকী সহায়তা লেনী হোগী। ইস্ বিষয়কা য়হ্ প্রয়াস হৈ, জিস্কে লিয়ে লেখক মহোদয় বধাইকে পাত্র হৈঁ।

শান্তিদেব ঘোষকে লিখিত পত্রাবলী

ও

অপ্রকাশিত দিনলিপি

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রিয় শান্তিদেব,

তোমার 'রবীন্দ্র-সংগীত' পুস্তকখানি লেখা খুব ভালো হয়েছে। রবীন্দ্রসংগীতের সব দিকে আলো ফেলে চর্চা করবার সুবিধা এই বইখানি যেমন দেবে এমন আর অন্য বই দেবে না, কেন না তুমি এই শান্তিনিকেতনে থেকে তাঁর মুখে শুনে ও তাঁর সঙ্গে থেকে এই-সব গানের যথার্থ সুর ও রাগরাগিণী ইত্যাদির মর্ম অবগত হয়েছ। বই পেয়ে এবং পড়ে আমি তোমাকে শত শত আশীর্বাদ দিচ্ছি— তোমারই

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০শে জুলাই, ১৯৪৩

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

সজ্জনবরেষু,—

... বইখানির পৃষ্ঠায় বহু অজ্ঞাতপূর্ব রত্নরাজির দর্শন পেলুম,— যা কবিবরের সহিত সুদীর্ঘ পরিচয় ও তাঁর স্নেহ-প্রীতির প্রাচুর্যের ভিতরেও সে সময়ে চোখে পড়ে নি। তাঁর অভিনব সংগীত সৃষ্টির অন্তরালে যে এমন অমূল্য বস্তু লুকানো রয়েছে তা কখনো কল্পনায় আসে নি। অতি পরিতাপের বিষয় এই যে চিরকাল তাঁকে চিরন্তনের বিরোধী মহাবিদ্রোহী শুনে শুনে এমনি আতঙ্কিত হতুম যে সংগীত নিয়ে তাঁর কাছে ঘেঁষবার আগ্রহ কখনো হয় নি। বরং জ্যোতিবাবুর সঙ্গে বেশ খোলা প্রাণেই মিশতে পেরেছি, আনন্দও পেয়েছি প্রচুর। মহাকবির সম্বন্ধে জীবনের সেই ভুল যে বেড়ে বেড়ে এত বড়ো হয়ে উঠবে তা কখনো ধারণাই করতে পারি নি। আজ অনুতাপ হচ্ছে, তিনি বেঁচে থাকতে তাঁকে যাচাই করবার উৎসাহটুকুও সংগ্রহ করতে পারি নি বলে।

আপনার বই পড়ে' অনেক অজ্ঞাত অবোধ্য সন্দিগ্ধ অর্থের সন্ধান পেলুম। আপনি আবাল্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গ ও শিক্ষায় শিক্ষিত, বর্ধিত হবার অসামান্য সুযোগ লাভ করে মহাসৌভাগ্যবান,— আর সেই সৌভাগ্য তাঁকে ও তাঁর সংগীতকে মনে প্রাণে জানবার বুঝবার শক্তি আপনাকে পূর্ণ মাত্রায়ই দিয়েছে— আপনি ধন্য। আপনার লেখায় রবীন্দ্রনাথের কথার কয়েকটি উদ্ধৃতি আর সেগুলি আপনার ব্যাখ্যায় আজ

ঘোর প্রহেলিকাচ্ছন্ন এক সমস্যার সমাধান, এক মহাসত্যের আবিষ্কার প্রত্যক্ষ করে শুধু বিস্মিত নয়, আমি বিমুগ্ধ হয়েছি। ধন্য মহাকবির মহাসাধনা আর কৃতকৃতার্থ আপনি তাঁর সাধনার মর্মস্থানে প্রবেশ করতে পেরেছেন।

"সুর-ব্রহ্ম" কথাটা আবাল্য শুনে আসছি। অন্ধভাবে এক কথায় অসীম শ্রদ্ধা বিশ্বাসও চিরকাল পোষণ করছি। কিন্তু বিষয়টি মোটেই ধারণা করতে পারি নি তবু মনে মনে তার একটা স্থূল মানেও ধরে রেখেছি— সুরের সঙ্গে চিন্ময় পরব্রহ্মের অতি ঘনিষ্ঠ কিন্তু মন-বুদ্ধির অগোচর বোধ হয় একটা কিছু সংযোগ— কথাটা আমার গোঁড়া স্বভাবে খাপ খায় বেশ, লাগে অতি মধুর। কিন্তু কত শতবার ভেবেছি সে সংযোগটা কেমন ধারা, কি করে তা হতে পারে, বুঝি নি কিছুই— ভেবে কূলের ছায়াও দেখতে পাই নি। প্রশ্ন করেও এমন সদুত্তর কোনো পণ্ডিত মহাত্মার কাছে পাই নি যাতে জিজ্ঞাসা মিটে যায়। এঁরা সংগীতের সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক রাজ্য প্রভৃতি উচ্চ উচ্চ প্রসঙ্গ এনে এর সঙ্গে নানা জটিল রহস্য জড়িয়ে দিয়ে বিষয়টাকে আরো দুর্ভেদ্য দুর্বোধ্যই করে দিয়েছেন— মীমাংসা কিছুই হয় নি। হবে কি করে, তাঁদের অশেষ দার্শনিক বা অন্যবিধ পাণ্ডিত্য ছিল বটে কিন্তু ছিল না তাঁদের সংগীতের যথার্থ রসধ্যান, রসজ্ঞান বা সাধনায় সিদ্ধি। এ তো ভাষার রাজ্যের বস্তু নয়, দর্শন মীমাংসায়ও এর তত্ত্ব মিলে না।...

আজ আপনার গ্রন্থ চোখের সামনে আমার চির আকাঙ্ক্ষিত সেই অজ্ঞাত রাজ্যের সুস্পষ্ট সন্ধান এনে দিয়েছে। এমন করে আপনার মতো তাঁকে কখনো আমরা চিনি নি— অতি দুর্ভাগ্য আমাদের। তবু এই আলোর পরিচয়টুকু আমাদের পথ প্রদর্শক হয়ে চলার পথ কতই না সরল সহজ করে দিতে পারবে তাই ভেবে আবার বলি ধন্য আপনি, সফল আপনার প্রয়াস, সার্থক আপনার "রবীন্দ্র-সংগীত"।...

শুভার্থী

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

ফাল্গুন, ১৩৪৯

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার 'রবীন্দ্র-সংগীত' পড়ে আনন্দ পেলাম ও সেই সঙ্গে অনেক কিছু নতুন তথ্য লাভ হল। আপনি যেভাবে নানা দিক থেকে রবীন্দ্রসংগীতের বিচার করেছেন তাতে মনে হয় বঙ্গীয় সুধীমণ্ডল বইখানাকে সাদরে গ্রহণ করবে।... তাঁর সুর সম্বন্ধে নিতান্ত আনাড়ি ভাবে কোনো কোনো প্রশ্ন আমার মনে কখনো কখনো উঠেছে। আপনার বই পড়ে সে-সব প্রশ্নের মীমাংসা করবার অনেকটা সহায়তা হল। তাঁর

কবিতার ছন্দকে গানের ছন্দের সঙ্গে কেমন করে মিলিয়েছেন আপনার এই আলোচনা আমার খুব ভালো লাগলো।... সুর নিয়ে তিনি কী ধরনের কতখানি পরীক্ষা করেছেন সে-বিষয়ে ধারণা না থাকলে কবি হিসাবে তাঁর গানের আলোচনা সম্পূর্ণ হতে পারবে না। আপনার বই এদিক থেকে ভবিষ্যৎ লেখকদের সাহায্য করতে পারবে। তাঁর গীতনাট্য ও নৃত্যনাট্য সম্বন্ধে আপনি যা বলেছেন তা আমার মতের সঙ্গে সম্পূর্ণ মেলে—

বুদ্ধদেব বসু
১৪-১-৪৩

শ্রীনন্দলাল বসু

কল্যাণীয় শ্রীমান শান্তিদেব ঘোষের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আশ্রমেই জন্ম। এখানকার বিশিষ্ট সাধনার আবহাওয়াতেই তিনি মানুষ। অত্যন্ত শিশুকাল থেকেই সংগীতে তাঁর স্বাভাবিক প্রবৃত্তির পরিচয় ও শক্তির বিকাশ লক্ষ্য করা গেছে। গুরুদেবের প্রতিভার নিত্য নব সৃজন উপলক্ষে আশ্রমে বা আশ্রমের বালক-বালিকাদের নিয়ে আশ্রমের বাইরেও যা-কিছু উৎসব অনুষ্ঠান নৃত্যগীত অভিনয় হয়েছে আশৈশব সে সমস্ততেই তিনি উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে ও প্রেরণায় ভারতীয় নৃত্যকলার যে নব অনুশীলন সূচিত হয়েছে তাতেও শান্তিদেব ঘোষকে অগ্রণী বলা উচিত। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ, সিংহল, বলি, যবদ্বীপ প্রভৃতি ভ্রমণ করে বিচিত্র নৃত্যধারার বিশেষ জ্ঞান লাভ করবার সুযোগও তাঁর হয়েছে। উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত নানা নৃত্যনাট্যে অনেক সময় তাঁকেই নৃত্যগীত পরিচালনার প্রধান দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছে।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ও শ্রদ্ধেয় দিনেন্দ্রনাথের এই উভয়ের কাছ থেকে তিনি রবীন্দ্র-সংগীত কণ্ঠে ও হৃদয়ে গ্রহণ করেছেন, এজন্য সেই সংগীতে গায়ক হিসেবে তাঁর সংগ্রহ যেমন প্রচুর, সে বিষয়ে তাঁর অধিকার এবং দরদও তেমনি অতুলনীয়। সম্প্রতি তিনি 'রবীন্দ্র-সংগীত' নাম দিয়ে যে রচনা প্রকাশ করেছেন, তাতে আমার মতো সংগীত-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আনাড়ি লোকেরও বোঝবার শেখবার বিষয় অনেক আছে। বস্তুত রবীন্দ্রসংগীত সম্বন্ধে এই গ্রন্থ বিশেষভাবেই প্রামাণিক এবং আমার যতদূর জানা আছে অপ্রতিদ্বন্দ্বীও বটে।

নন্দলাল বসু
জুলাই, ১৯৪৩

শ্রীইন্দিরা দেবী

বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ আমাকে রবীন্দ্রনাথের সংগীত সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষের যে রচনাগুলি পড়তে দিয়েছিলেন, সেগুলি এক নজরে যতটা সম্ভব পড়ে দেখেছি।

রবীন্দ্রনাথের সংগীত, অভিনয়, নাট্যপ্রযোজনা প্রভৃতি বিষয়গুলির সম্বন্ধে আলোচনা করতে যে শান্তিদেব সম্পূর্ণ অধিকারী, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। এমন-কি দিনেন্দ্রনাথের অভাবে তিনি বর্তমানে এ সম্বন্ধে মত প্রকাশ করতে একমাত্র সমর্থ ব্যক্তি বললেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ অল্পবয়স থেকেই তিনি শান্তিনিকেতনের সংগীতাভিনয়ের আবহাওয়ায় মানুষ, এবং এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পেয়েছেন। নিজেও সে শিল্পকলাকুশল বলে সে সুযোগ গ্রহণও করতে পেরেছেন।

শ্রীইন্দিরা দেবী
মার্চ, ১৯৪২

ডাঃ অমিয়নাথ সান্যাল

মান্যবরেষু মহাশয়,—
আপনার রচিত "রবীন্দ্র-সংগীত"খানি পেয়ে যতখানি আনন্দ হল— তার চেয়ে বেশি আনন্দ হল বইখানি আদ্যোপান্ত পড়ে। অতএব আপনাকে দুতরফা ধন্যবাদ করচি। রবীন্দ্রসংগীতের প্রাণ, মূল-কথা এবং পত্রপল্লবগুলিকে বিষয় করে আপনি যেভাবে আপনার বক্তব্যগুলিকে সাজিয়েছেন— তা থেকে সুন্দর ও সুপাঠ্য কোনো চেষ্টার কথা আমি জানি না। এমনও হতে পারে যে— আমি আপনার পন্থার যাত্রী, সেজন্য আপনার ভাবগুলি আমার ভালো লেগেছে। যাই হোক না কেন— আমি নিজেও ওরূপ সুন্দরভাবে মার্মিক কথাগুলি প্রকাশ করতে পারতাম না— এটুকু আমি বলতে কুণ্ঠিত হব না।

ভবদীয়
শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল
কৃষ্ণনগর, অগস্ট, ১৯৩৪

Founder-President
Rabindranath Tagore

VISVA-BHARATI

SANTINIKETAN,
BENGAL, INDIA.

Ref. No.

২৪.৬ 1935.

কল্যাণীয়েষু —

তোর কাছে সেদিন 'অভিনয় কমিটি' থেকে কলকাতার অভিনয় সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন। সব ঠিক হয়ে গেছে। চণ্ডালিকার প্রধান পার্ট নেবার জন্য বুড়ী-ভগ্নীদের সঙ্গে ২৬শে যাচ্ছে। বুড়ী-হাতেও যাদের পাওয়া যাবে তাদের নামের ফিরিস্তি পাঠাচ্ছি। এদের মধ্যে দুজন [illegible] পরীক্ষা দিচ্ছে — অন্যেরা দিল্লী-যাচ্ছে। অনেকেই কিন্তু ৩০শে পাওয়া যাবে। তাই প্রতিমা ঠিক করছেন ১লা থেকে রীতিমত রিহার্সাল সুরু করান হবে। প্রত্যহ হয় সকালে বিকেলে দু বেলা রিহার্সাল [illegible] চলবে। এ ছাড়াও কাউকে যদি দরকার হয় তো জানাস্ — চেষ্টা দেখব।

আমরা একজন ভাল মণিপুরী-নাচিয়েকে [illegible] করেছি তার সঙ্গে একটি মেয়েকে যুক্ত করে কলকাতায় চলে আসতে। [illegible] চিঠি দিয়েছেন। সে বেশ ভাল নাচিয়ে। কাজে লাগবে।

VISVA-BHARATI

FOUNDER-PRESIDENT
RABINDRANATH TAGORE

PRESIDENT
ABANINDRANATH TAGORE

SANTINIKETAN,
BENGAL, INDIA.

REF. No.

কল্যাণীয়েষু,

২২শে শ্রাবণের পর থেকে এক সপ্তাহ ধরে বেতার বিভাগ কোথায় রবীন্দ্রসাহিত্য থেকে পাঠ ও আলোচনা চলবে স্থির হয়েছে। এই একদিন ভিন্ন ২ বিষয় অবলম্বন করা হবে, ১১ই দিন হবে সঙ্গীত বিষয়। কর্মীদের ইচ্ছা ঐ দিনের আলোচনার ভার তোমাকে দেওয়া হয়। ১১ই এখানে উপস্থিত থাকা সম্ভব হবে কি না ও এই কাজের ভার নিতে পারবে কি না অবিলম্বে আমাকে জানালে খুশি হব। পুরো এক ঘণ্টাও দরকার নেই — ৪৫ মিনিটের মত — সঙ্গীত সম্বন্ধে বাবার লেখা থেকে পাঠ ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা; দরকার হলে দু'চারটে গান illustration হিসাবে গাওয়াও যেতে পারে।

তোমার allowance সম্বন্ধে [illegible]

কল্যাণীয়াসু —

২০শে সন্ধ্যাবেলায় College Industry Board সদস্যদের জন্য entertainment-এর আয়োজন করেছি। সেই উপলক্ষ্যে একটা দুটো গান হলে ভালো হ।

প্রোগ্রাম ছাপাতে দিচ্ছি — তাই যদি সাহায্য সম্ভব হয় তবে কী গান গাওয়াবে জানালে আগে থেকে সুবিধা হয়। ইতি

রথীন্দ্র

17.1.51

My dear Shanti

I am sorry so far Bapuji had not listened to your singing. Will you kindly come to Uttarayan at 8 P.M. prepared to sing a few songs for Bapuji's party?

Yours Sincerely
Aryanda
19.12.45

Santiniketan

(Aryanayakam)

ই. ডাব্লু. আর্যনায়কমের পত্র

Monday 19th MARCH 1962

5 chaitra 1368 28 phalguna 1883 12 shawal 1381 13 falgoon sudi 2018

Thursday 18 AUGUST 1977

বৃহস্পতি ১ ভাদ্র ১৩৮৪

সম্বত — ৪ শ্রাবণ সুদী ২০৩৪

[illegible]